হিংসা ও গোস্বা : দুটি ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি

হিংসা ও গোস্বা : দুটি ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি মূলত বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহু তাআলার দুটি চমৎকার ও অসাধারণ বয়ান।

এ বয়ান দুটিতে হযরত শাইখুল ইসলাম ছাহেব হাফি. বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। পেশ করেছেন নিখুঁত এক্স রে রিপোর্ট।

বয়ানদ্বয়ের প্রতিটি বাক্যে হযরতওয়ালার দরদে দিলের ছাপ সুস্পষ্ট। কেউ মনোযোগ সহ গ্রন্থটি পাঠ করলে তার দিলের হালত ও মনের অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ এ বয়ান দুটি হল পরিশুদ্ধ হৃদয় উৎসারিত অনুপম কথামালা। এতে আছে অন্তর নিংড়ানো তথ্য ও তত্ত্ববহুল মূল্যবান আলোচনা। হক কথা, হক নিয়্যতে, হক পন্থায় উপস্থাপিত, আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য অব্যর্থ মহৌষধতুল্য খুবই সুন্দর একটি গ্রন্থ **“হিংসা ও গোস্বা : দুটি ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি”**

অনুবাদকের আরয

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বানিয়েছেন। মানব জাতির সম্মান সবচেয়ে বেশি। কারণ তাদের যিম্মাদারী বা দায়িত্বও সবচেয়ে বেশি।

দুনিয়াতেও দেখা যায়, রাজার সম্মান বেশি। প্রজার সম্মান কম। হোটেল কর্মচারীর তুলনায় হোটেলে ম্যানেজারের সম্মান বেশি। কারণ? সুস্পষ্ট। মাদরাসা-স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে মুহতামিম (অধ্যক্ষ) বা মহাপরিচালকের মর্যাদা বেশি। যেহেতু তাঁর দায়িত্ব বেশি। অফিসের টিম লিডার বা দলনেতার সম্মানও বেশি। বেতনও বেশি, দায়িত্বও বেশি।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে।

মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধি। যেহেতু আত্মা হল শরীরের রাজা। আরবীতে প্রবাদ প্রসিদ্ধ الناس على دين ملوكهم অর্থাৎ যেরকম রাজা সেরকম প্রজা।

এ কারণেই দিলের রোগের চিকিৎসা করা ফরযে আইন। অথচ শারীরিক রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত।

আত্মিক ব্যাধিগুলো এমনই ভয়ংকর যে, একটি ব্যাধিই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আত্মার এমন দশটি ব্যাধি নিম্নরূপ।

১. লোভ, ২. অধিক কথা বলার আগ্রহ, ৩. ক্রোধ বা গোস্বা, ৪. হাসাদ বা হিংসা, ৫. কার্পণ্য বা বখিলী, ৬. সম্মান-কামনা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, ৭. দুনিয়ার মহব্বত, ৮. তাকাব্বুর বা অহংকার, ৯. খোদ-পছন্দী, ১০. রিয়াকারী।

এই দশটি বদ-স্বভাবকে বর্জন করে দশটি ভালো স্বভাব অর্জন করতে হয়। দশটি প্রশংসনীয় স্বভাব হল এই:

১. তাওবা, ২. খওফ বা খোদাভীতি, ৩. যোহদ বা দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ, ৪. সবর বা ধৈর্যশীলতা, ৫. শোকর বা কৃতজ্ঞতা, ৬. ইখলাস বা খালেস নিয়্যত, ৭. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ তাআলার উপর আস্থা, ৮. আল্লাহ পাকের মহব্বত, ৯. তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি, ১০. মৃত্যুচিন্তা।

মূলত এ কারণেই শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ এর ইসলাহী খুতুবাতের দুটি চমৎকার ও অসাধারণ বয়ান, حسد: ایک معاشرتی ناسور অর্থাৎ "হিংসা একটি সামাজিক দুষ্টক্ষত" এবং غصے کو قابو میں کیجئے বা "গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন" নিয়ে মননশীল ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের অভিজাত প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান "দারুণ কুতুব" এর এবারের আয়োজন "হিংসা ও গোস্বা: দুটি ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি"।

এ বয়ান দু'টিতে হযরত শাইখুল ইসলাম ছাহেব বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বয়ানদ্বয়ের প্রতিটি বাক্যে হযরত ওয়ালার দরদে দিলের ছাপ সুস্পষ্ট। কেউ মনোযোগ সহ গ্রন্থটি পাঠ করলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তার হালত পরিবর্তন হবে। হতে বাধ্য। কারণ এসব বয়ান হল از دل خیزد بر دل ریزد "অন্তর হতে উৎসারিত হয়ে অন্তরে রেখাপাত করে" এর মিসদাক قلندر آنچہ صوید دیدہ گوید "আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ যা কিছু বলেন দেখে বলেন" এর বাস্তব চিত্র হল হযরতের এ দুটি হৃদয় নিংড়ানো তথ্যবহুল আলোচনা।

যেহেতু হক কথা হক নিয়্যতে এবং হক পন্থায় বললে অবশ্যই ক্রিয়াশীল হয় যেমনটি বলতেন আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. কাজেই অত্র গ্রন্থের প্রতিটি কথাও যেহেতু হক কথা হক নিয়্যত ও হক উপস্থাপনায় সুসমৃদ্ধ, সুতরাং এটাও অব্যর্থ মহৌষধের ন্যায় কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

তবে এর পাশাপাশি আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে পরামর্শ দিব সরাসরি কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা হল কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ব্যতীত শুধু কিতাব দেখে দেখে আত্মিক ব্যাধি দূর হয় না। তবে হ্যাঁ, কিতাব দেখার ফায়েদাই নাই সে কথা বলছিনা। ফায়েদা তো অবশ্যই আছে। সবচেয়ে বড় ফায়েদা হল এর দ্বারা অন্তরে একটি অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমার ইসলাহ দরকার। সংশোধন প্রয়োজন। এটাই এ যুগে কম কি? অনেক কিছু। বাজারে ডাক্তারী বিষয়ক, আইন সম্পর্কীয়, রান্না সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি অনেক বই যাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো নিজে নিজে পড়ে কেউ যথাক্রমে ডাক্তার ব্যারিস্টার বা রন্ধনশিল্পী হতে পারে না। বরং এগুলোর জন্য সাহচর্য বা সান্নিধ্য জরূরী। ঠিক তদ্রুপ اخلاق رذیلہ তথা অন্তরের বদস্বভাবগুলো দূর করার জন্যও কোন খাঁটি বুযুর্গের সোহবত, সংশ্রব অত্যাবশ্যক। এছাড়া আত্মার পরিশোধন প্রায় অসম্ভবই বটে।

যাই হোক, এবার আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সম্পর্কে দুটি কথা।

প্রথম কথা হল, আত্মার দশটি ময়লার মধ্যে শুধুমাত্র দুটি রোগ সম্পর্কীয় কিতাবের অনুবাদ কেন করলাম?

এর উত্তর হল: বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি। অর্থাৎ সামাজিক পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে হিংসা ও গোস্বা বিষয়ে কিছু একটা করার জন্য। কারণ সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতার অনেকগুলো কারণের পাশাপাশি এ দুটো আত্মিক ও সামাজিক ব্যাধি বহুলাংশে দায়ী। এই হিংসা ও গোস্বার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষ। শত সহস্র সোনার সংসার। অসংখ্য মহিলা হচ্ছেন স্বামীহারা বিধবা। বা সন্তানহারা মা। বা ছেলেমেয়ে হচ্ছে ইয়াতীম।

এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে আমাদের এ গ্রন্থটি আশা করি প্রচন্ড গরমে এক পশলা স্বস্তিদায়ক বৃষ্টি হবে। অথবা হবে ক্ষতস্থানের জ্বালা দূরকারী শীতল মলম। কিংবা উষর মরুর ধূসর বুকে এক

চিলতে সবুজ উদ্যান বা সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া মানুষের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন।

মহান আল্লাহ আমাদের এ সামান্য উদ্যোগকে কবূল করে নিন। অত্রগ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত সকলকেও মাকবূল বানিয়ে দিন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
তারিখ: ১৬/১২/৪৩ হি:
১৬/০৭/২২ ইং
সকাল ৭:৪৪ মি:

بسم الله الرحمن الرحيم

حسید: ایک معاشرتی ناسور

হিংসা: একটি সামাজিক দুষ্টক্ষত

বাদ হামদ ও সালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নিশ্চয়ই হিংসা নেক আমলসমূহকে ঐভাবে গ্রাস করে ফেলে যেমন আগুন কাষ্ঠখন্ড বা শুকনো ঘাসকে গ্রাস করে ফেলে।"[১]

হিংসা একটি আত্মিক ব্যাধি

যেমনিভাবে মহান আল্লাহ আমাদের বাহ্যিক আমলসমূহের মধ্যে কিছু কিছু জিনিসকে ফরয এবং ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন অনুরূপভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ আমলসমূহের মধ্যে অনেকগুলো আমল ফরয। আবার অনেক আমল আছে যেগুলো গুনাহ এবং হারাম। এগুলো হতে সতর্ক থাকাও সেরকমই জরুরী যেমনটি জরুরী প্রকাশ্য গুনাহ হতে বেঁচে থাকা।

আজ আমরা এমনই এক ভয়াবহ আত্মিক ব্যাধি সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। সেই ব্যাধিটি হল "হিংসা"।

---

১. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হিংসা অধ্যায়, হাদীস নং ৪৯০৩

হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে

একটা তো হল ঐ আগুন যা বড় মারাত্মক। যা মিনিটের মধ্যে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। আরেকটা হল ঐ আগুন যা ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে। এই আগুন কারো শরীরে লেগে গেলে এক মুহূর্তে তাকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয় না বরং ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে এবং অল্প অল্প করে তাকে গ্রাস করতে থাকে। এমনকি পুরো কাষ্ঠখণ্ড জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে হিংসা এমন একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি যা ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে এবং মানুষের খবরও থাকেনা যে, আমার নেকীসমূহ খতম হয়ে যাচ্ছে। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকীদ করেছেন।

হিংসা থেকে বাঁচা ফরযে আইন

কিন্তু যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব, এই হিংসার ব্যাধি পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। আল্লাহ পাকের খুব কম বান্দাই এমন আছেন যারা এ ব্যাধি থেকে মুক্ত। নতুবা কোন না কোনভাবে হিংসা অন্তরে এসেই পড়ে। অথচ এর থেকে বাঁচা ফরযে আইন। এটা থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত উপায় নেই। কিন্তু আমাদের এদিকে ধ্যান বা খেয়ালই যায় না যে, আমরা এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এজন্য এ থেকে বাঁচার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

প্রথমে এটা বুঝে নিন যে, হিংসার প্রকৃত মর্ম কী? এবং এটা কয় প্রকার ও কী কী? এর উপলক্ষসমূহ কী কী? এবং এর চিকিৎসাই বা কি? এই চারটি কথা আমার আজকের বয়ানের আলোচ্য বিষয়।

আল্লাহ তাআলা এই বয়ানকে আমাদের অন্তরসমূহ হতে এই ব্যাধি দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

হিংসার সংজ্ঞা

হিংসার সংজ্ঞা হল একজন আরেকজনকে দেখল যে, তার কোন নেয়ামত লাভ হয়েছে। চাই সে নেয়ামত দুনিয়ার হোক বা দ্বীনের। এই নেয়ামত দেখে তার অন্তরে জ্বালা যন্ত্রণা বা কষ্ট সৃষ্টি হল যে, সে এই নেয়ামত কেন পেল? আর মনের মধ্যে এই কুবাসনা জাগ্রত হল যে, এই নেয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। এই হল হিংসার সংজ্ঞা।

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন বান্দাকে মাল দৌলত দিয়েছেন। অথবা কাউকে দিয়েছেন সুস্বাস্থ্য। আবার কাউকে দিয়েছেন প্রসিদ্ধি। আবার কাউকে দিয়েছেন সম্মান। কাউকে দিয়েছেন ইলম বা জ্ঞান।

এখন অন্য কারো অন্তরে এই খেয়াল জাগ্রত হচ্ছে যে, এই নেয়ামত সে কেন পেল? তার থেকে যদি এ নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হত, তবে ভাল হত।

আর ঐ ব্যক্তির মনের বিপরীত কোন অবস্থা সামনে আসলে সে খুশী হয় এবং তার উন্নতি বা সাফল্য সামনে আসলে অন্তরে ব্যথা ও কষ্ট অনুভূত হয় যে, সে কেন আগে বেড়ে গেল? এটার নামই হিংসা।

এখন হিংসার এই বাস্তবতা কে সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝে আসবে যে, হিংসুক ব্যক্তি মূলত মহান আল্লাহর তাকদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যে, আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত তাকে কেন দিলেন? আমাকে কেন দিলেন না? এটা তো মহান আল্লাহর ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি! নিজ অনুগ্রহকারী মহান দাতার উপর আপত্তি!! আবার সাথে সাথে এ আকাঙ্খাও করছে যেন কোনভাবে এই নেয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। এ কারণেই এর ভয়াবহতা অনেক বেশি।

“ঈর্ষা” করা জায়িয

আরেকটা ব্যাপার বুঝে নিন। অনেক সময় এমন হয় যে, অন্যের মধ্যে কোন নেয়ামত দেখে সেটা নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাঙ্খা জাগে। তো এটা ভাল। এটা হাসাদ বা “ হিংসা” নয় বরং “ঈর্ষা”। আরবীতে এটাকে “গিবতা” বলা হয়। অবশ্য অনেক সময় আরবী ভাষাতে এটার ক্ষেত্রেও “হাসাদ” শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা হিংসা নয়। উদাহরণস্বরূপ কারো ভালো বাড়ি দেখে অন্তরে এ আকাঙ্খা জাগ্রত হল যে, যেমনিভাবে এর বাড়ী সুন্দর ও আরামদায়ক আমারও যদি এমন একটা বাড়ি হত। অথবা উদাহরণস্বরূপ যেরকম চাকুরী সে পেয়েছে, সে রকম একটা চাকুরী যদি আমারও হত। অথবা আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে যেমন ইলম দান করেছেন সেরকম ইলম যদি আমারও থাকত। এগুলো হিংসা নয় বরং ঈর্ষা। এতে কোন গুনাহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্তরে অপর ভাই বা বোনের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার আকাঙ্খা জাগ্রত হয় তবে সেটাই হবে হিংসা। যা সম্পূর্ণ হারাম।

হিংসার তিনটি স্তর

হিংসার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল অন্তরে এমন চাহিদার উদ্রেক হওয়া যে, আমারও এমন নেয়ামত হাসিল হোক। এখন যদি অন্যজনের কাছে থাকা অবস্থায় হাসিল হয়, তাহলে তো খুব ভাল। নতুবা তার থেকে যেন ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সেটা আমার হয়ে যায়।

এটা হল হিংসার প্রথম স্তর। এখানে প্রথম পদক্ষেপে আকাংখা হল সেটা ছিনিয়ে নেয়া হোক। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপে আকাংখা হল যেন সেটা আমি পেয়ে যাই। এটা হিংসার দ্বিতীয় স্তর।

হিংসার তৃতীয় স্তর হল অন্তরে এমন বাসনা জাগ্রত হল যে, এই নেয়ামত যে কোনভাবে তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। এবং এ নেয়ামতের কারণে তার যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয়েছে, সেটা থেকে

সে বঞ্চিত হয়ে যাক। পরবর্তীতে সেই নেয়ামত আমার হাসিল হোক বা না হোক।

এটা হিংসার সব থেকে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম স্তর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব থেকে হেফাযত রাখুন। আমীন।

সর্বপ্রথম হিংসাকারী

সর্বপ্রথম হিংসাকারী হল ইবলীস। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ ঘোষণা করে দেন যে, আমি একে পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাব। খেলাফত দান করব। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর মর্যাদা প্রকাশের জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা হযরত আদম আ. কে সেজদা করে। ব্যস এই নির্দেশ শুনে ইবলীস জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল যে, আদমের আ. এই মর্যাদা নসীব হল, আমার হল না। ফলশ্রুতিতে সে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। সুতরাং সর্বপ্রথম হিংসাকারী হল শয়তান। আর সর্বপ্রথম অহংকারকারীও শয়তান।

হিংসার অনিবার্য পরিণতি

আর এই হিংসার একটি অনিবার্য পরিণতি এই হয় যে, যার সাথে হিংসা করা হয়, যদি তার উপর কোন মুসীবত পৌঁছে তবে এই হিংসাকারী তার দুঃখ-মুসীবত দেখে আনন্দিত হয়। আর যদি তার উন্নতি দেখে বা সে কোন নেয়ামত পেয়ে যায়, তবে এই হিংসুক ব্যক্তি হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকে। অন্যের কষ্টের উপর আনন্দিত হওয়াকে আরবীতে شَمَاتَةٌ বলা হয়। এটাও হিংসার একটি প্রকার। কুরআনে কারীম ও হাদীসে পাকের কয়েকটি স্থানে এর নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ "নাকি তারা এই কারণে মানুষের প্রতি হিংসা করে যে, তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করেন।"[২]

হিংসার কারণ দুটি

এই হিংসা ব্যাধির কারণ কি? আর এই ব্যাধি অন্তরে কেন সৃষ্টি হয়? এর কারণ দু'টি। এর একটি কারণ হল দুনিয়ার মাল দৌলতের ভালবাসা। পদের মোহ। এজন্য মানুষ সব সময় কামনা করে যেন আমার এত বড় মর্যাদা হাসিল হয়। আমি যেন উঁচু থাকতে পারি। এখন যদি অন্য কেউ আগে বেড়ে যায় তখন এ তাকে নিচে নামানোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দেয়। এই ব্যাধির অপর কারণ হল "ঘৃণা" ও "বিদ্বেষ"। উদাহরণস্বরূপ কারো ব্যাপারে অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল, আর ঐ বিদ্বেষের ফলে তার আরাম দেখলে কষ্ট লাগে। সুখ দেখলে দুঃখ লাগে। অন্তরে এ দু'টি জিনিস থাকলে অনিবার্য ফলস্বরূপ হিংসা পয়দা হবে।

হিংসার দরুন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি ধ্বংস হয়ে যায়

এই হিংসা এমনই মারাত্মক একটি আত্মিক ব্যাধি যে, মানুষের আখেরাতকে ধ্বংস করে দেয়। বরং দুনিয়াতেও মানুষের জন্য ধ্বংসশীল একটি রোগ। কাজেই এটার কারণে দুনিয়ারও ক্ষতি। আখেরাতেরও ক্ষতি। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করে, সে সব সময় দুঃখ-কষ্টে থাকবে। কেননা যখনই সে দেখবে যে, অপরজন তার থেকে আগে বেড়ে যাচ্ছে, তখন তাকে দেখে তার অন্তরে দুঃখ-ব্যথা সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাবে।

---

২. সূরা নিসা: ৫৪

হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে

আরবী ভাষায় একটি কবিতা আছে। যার ভাবার্থ হল, হিংসার উদাহরণ হল আগুনের ন্যায়। আর আগুনের বৈশিষ্ট্য হল সে গ্রাস করার মত কোন বস্তু পেলে সেটাকে গ্রাস করতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ লাকড়ীতে আগুন লাগল, তো ঐ আগুন লাকড়ীটাকে গ্রাস করতে থাকবে। কিন্তু যখন লাকড়ী শেষ হয়ে যাবে, তখন আগুনের এক অংশ অপর অংশকে খাওয়া শুরু করে দিবে। এমনকি ঐ আগুনও শেষ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে হিংসার আগুনও এমন। হিংসাকারী ব্যক্তি প্রথমে তো অন্যকে খারাপ করার এবং অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন অন্যের ক্ষতি করতে পারে না, তখন হিংসার আগুনে নিজে জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

হিংসার প্রথম চিকিৎসা

এই হিংসা রোগের চিকিৎসা হল ঐ ব্যক্তি এটা চিন্তা করবে যে, মহান আল্লাহ এ জগতে আপন বিশেষ হেকমত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে নিজ নেয়ামতসমূহ বণ্টন করেছেন। কাউকে এই নেয়ামত দিয়েছেন, তো কাউকে দিয়েছেন ঐ নেয়ামত। কাউকে সু-স্বাস্থ্যের নেয়ামত দিয়েছেন, কাউকে ধন-সম্পদের নেয়ামত দিয়েছেন। কাউকে দিয়েছেন ইজ্জত-সম্মানের নেয়ামত। কাউকে দিয়েছেন সৌন্দর্যের নেয়ামত। আবার কাউকে দিয়েছেন প্রশান্তির নেয়ামত। এ পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে কোন না কোন নেয়ামত পায়নি। অথবা কোন না কোন কষ্টে নিপতিত নেই।

তিন জগত

কেননা মহান আল্লাহ তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটি হল ঐ জগত যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। সেটা হল

জান্নাতের জগত। মহান আল্লাহ আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিন। আমীন। সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি আরামই আরাম।

আরেকটা জগত ঠিক এর বিপরীত। যার মধ্যে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। দুঃখ আর দুঃখ। ব্যথা আর ব্যথা। সুখ শান্তির কোন নাম নিশানাও সেখানে নেই। সেটা হল জাহান্নামের জগত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তৃতীয় একটি জগত আছে সেটা উভয়টার সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে সুখও আছে, দুঃখও আছে, শান্তিও আছে, অশান্তিও আছে। সেটা হল এ পৃথিবীর জগত। যেখানে আমরা বসবাস করছি। এই পৃথিবীর জগতে এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যে এ কথা বলবে যে, আমার সারা জীবনে কখনো কোন কষ্ট হয়নি। আবার এমন কোন মানুষও পাওয়া যাবে না যার কখনো আরাম বা শান্তি লাভ হয়নি। এ জগতে প্রত্যেক খুশীর সাথে দুঃখের কাঁটাও লাগানো থাকে। আর প্রত্যেক কষ্টের মধ্যে শান্তিও লুকায়িত থাকে। এখানের সুখও নিরবিচ্ছিন্ন নয়, আবার এখানের দুঃখও নিরবিচ্ছিন্ন নয়।

প্রকৃত শান্তি পেয়েছে কে?

যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আপন হেকমতে পুরো জগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে একেক জনকে একেক নেয়ামত দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্যের নেয়ামত দান করেছেন, তো অপর কাউকে তার বিপরীত ধন-সম্পদের নেয়ামত দান করেছেন। এখন ধন-সম্পদওয়ালা ব্যক্তি স্বাস্থ্যওয়ালা ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করছে যে, সে এতো ভাল স্বাস্থ্য কেন পেল? আবার এদিকে ঐ স্বাস্থ্যওয়ালা ব্যক্তি ধন-সম্পদওয়ালার ব্যাপারে হিংসা করছে যে, সে এত এত সম্পদ কিভাবে পেল?

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা হল তাকদীরের ফয়সালা এবং তারই হেকমত ও মাসলাহাত এর উপর নির্ভরশীল। আর কোন মানুষ অন্যের

ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবে না যে, কোন্ মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শান্তিতে আছে।

বাহ্যিকভাবে অনেক সময় দেখা যায় একজন মানুষের অনেকগুলো কারখানা চলছে। বাংলো দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ী চলছে, চাকর নকর আছে, দুনিয়া ভর্তি আরাম আয়েশের উপকরণ বিদ্যমান পক্ষান্তরে একজন শ্রমিক মানুষ যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর ভাঙ্গে, আর অতি কষ্টে নিজ পেট ভরার ব্যবস্থা করে। এখন যদি এই শ্রমিক ঐ ধন সম্পদশালী মানুষটাকে দেখে তাহলে এটাই চিন্তা করবে যে, সে তো পৃথিবীর অনেক বড় বড় নেয়ামত পেয়েছে।

কিন্তু যদি সাথে সাথে এ উভয় জনের ভিতরগত জীবনে উঁকি মেরে দেখা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, যে ব্যক্তির মিল কারখানা প্রতিষ্ঠিত, যার বাড়ী গাড়ী আছে, আর যার কাছে অসংখ্য ধন সম্পদ ও সীমাহীন প্রাচুর্যের উপলক্ষ বিদ্যমান; তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, রাতে যখন বিছানায় শোয় তো ঐ সাহেব বাহাদুরের ঐ সময় পর্যন্ত ঘুম আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমের ট্যাবলেট না খায়! অথচ তার দস্তরখানে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী বিদ্যমান। নানা ধরণের ফল-ফ্রুট উপস্থিত, কিন্তু তার পাকস্থলী এত খারাপ যে, এক দুই লোকমাও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। কেননা তার পাকস্থলীতে হয়েছে আলসার। এজন্য ডাক্তার সাহেব নিষেধ করে দিয়েছেন অমুক অমুক জিনিস খাবেন না। এখন সমস্ত নেয়ামত সমস্ত খাদ্য তার জন্য বেকার। এবার আপনিই বলুন কোন্ ব্যক্তি শান্তিতে আছে? যার কাছে শান্তি সুখের সমস্ত আসবাব আছে কিন্তু সে ঘুম হতে বঞ্চিত। খানা হতে বঞ্চিত। আর আরেকজন মানুষ সাধারণ শ্রমিক। যে আট ঘণ্টার কঠিন ডিউটি দেয়ার পর শাক-রুটি আর চাটনী রুটি খুব ক্ষুধা লাগার পর স্বাদ ও মজা নিয়ে খায়। আর যখন বিছানায় ঘুমায় তখন সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। আট-দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ভরপুর ঘুম দিয়ে উঠে।

প্রকৃত শান্তি কার মধ্যে আছে? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝে আসবে যে, প্রথম ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসবাব ও সামান

নিঃসন্দেহে দান করেছেন। কিন্তু প্রকৃত শান্তি দান করেছেন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে। এসবই হল মহান আল্লাহর হেকমতের ফয়সালা।

"রিযক" একটি নেয়ামত আর "খাওয়ানো" আরেকটি নেয়ামত

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন, আমীন। একবার বলছিলেন: খানার পরে এই যে দু'আ পড়া হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ أَطْعَمَنِیْ هٰذَا وَرَزَقْنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খানা খাইয়েছেন এবং এ রিযিক আমাকে আমার কোন প্রচেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই দান করেছেন। যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এ দু'আ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার অতীতের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[৩]

অতঃপর আমার সম্মানিত পিতা বলেন: এ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি হল رَزَقَنِيْهِ আর অপরটি হল أَطْعَمَنِیْ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে রিযিক দিয়েছেন এবং এ খানা খাইয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন উভয় শব্দের মর্ম একই, তখন উভয়টিকে পৃথক পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করলেন? একটি শব্দই বলে দেয়া যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি নিজেই উত্তর দিয়ে বলেন, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা রিযিক হাসিল হওয়া একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত আর খানা খাওয়ানো আরেকটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। কেননা অনেক সময় রিযক হাসিল হওয়ার নেয়ামত তো হাসিল হয় যে, ঘরে উন্নত খানা রান্না অবস্থায় প্রস্তুত, আর সব ধরণের ফল-ফ্রুট বিদ্যমান কিন্তু ক্ষুধা

৩. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫২৩

লাগছেনা। পাকস্থলী খারাপ। আর ডাক্তার সাহেবও গরুপাক জাতীয় খাদ্য খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এখন এমতাবস্থায় رَزَقْنَا তো হাসিল আছে, কিন্তু أَطْعَمْنَا হাসিল নেই। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রিযিক দিয়ে রেখেছেন কিন্তু খাওয়ার যোগ্যতা এবং হজম করার শক্তি দেননি।

যাই হোক, এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার হেকমত ও মাসলাহাত আছে যে, একেক জনকে একেক নেয়ামত দান করেছেন।

মহান আল্লাহর হেকমতের ফয়সালা

এজন্য হিংসার চিকিৎসা হচ্ছে এই যে, হিংসুক ব্যক্তি এটা চিন্তা করবে যে, যদি অন্য কেউ বড় কোন নেয়ামত হাসিল করে, আর সেটার কারণে তার অন্তরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, তাহলে কত নেয়ামত তো এমনও আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাকে দান করেছেন আর ঐ ব্যক্তিকে দান করেননি। হতে পারে মহান আল্লাহ তোমাকে তার থেকে ভালো স্বাস্থ্য দান করেছেন। অথবা হতে পারে যে মহান আল্লাহ তোমাকে তার থেকে বেশি সৌন্দর্য দান করেছেন, অথবা অন্য কোন নেয়ামত মহান আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, যেটা সে পায়নি।

সুতরাং এসব নেয়ামতের বণ্টনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হেকমত ও গূঢ় তত্ত্ব আছে। যেটা মানুষ বলতেও পারে না। এভাবে চিন্তা করলে হিংসা ব্যাধি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

উর্দূ ভাষার একটি প্রবাদ

এই যে উর্দূ ভাষায় একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ যে,

اللہ تعالی گنجے کو ناخن نہ دے

“আল্লাহ তাআলা টাক মাথা বিশিষ্ট মানুষকে নখ না দিক” এটা দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত উদাহরণ। যার মর্ম হল, যদি মাল দৌলতের নেয়ামত

তোমার হাসিল না থাকে, যদি তোমার এসব থাকত তাহলে না জানি এর কারণে তুমি কী ফাসাদ সৃষ্টি করতে আর কোন আযাবে লিপ্ত হতে! আর এটার কী পরিমাণ অবমূল্যায়ন করতে, যদ্দরুন তোমার অবস্থা না জানি কেমন হত, এখন যখন মহান আল্লাহ তোমাকে এ নেয়ামত দেননি সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে দেননি।

এজন্যই কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

অর্থাৎ "মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কতক কে কতকের উপর যা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, সেটার আকাংখা করো না।"[৪]

কেন? কারণ তোমার কী জানা আছে যে যদি ঐ নেয়ামত তোমার হাসিল হত, তাহলে তুমি কী দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে!! এমন ঘটনা প্রায়ই শোনা যায় যে, একজন মানুষ আকাংখা করে যে, আহা আমি যদি ঐ নেয়ামতটি পেতাম, কিন্তু যখন ঐ নেয়ামতটি পেয়ে যায়, তখন সেটা উপকারী হওয়ার পরিবর্তে তার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

এজন্য সর্বপ্রথম এটা চিন্তা করা উচিত যে, এই যে অন্য কেউ নেয়ামত পেয়ে যাওয়ার কারণে আমার অন্তর জ্বলতেছে, এটা বাস্তবিক পক্ষে মহান আল্লাহর তাকদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন এবং এর হেকমত থেকে উদাসীনতার ফলাফল। হতে পারে একারণে আপনার আরো বড় কোন নেয়ামত হাসিল হবে। যেটা তার হাসিল নেই।

স্বীয় নেয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন

আর এই সব খারাবী এজন্যই সৃষ্টি হয় যেহেতু মানুষ নিজের দিকে তাকানোর পরিবর্তে অন্যের দিকে তাকায়। নিজের যে নেয়ামত হাসিল আছে, সেদিকে কোন ধ্যান খেয়ালই নেই। সেটার উপর

৪. সূরা নিসা: ৩২

আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ের তাওফীক হচ্ছেনা। কিন্তু অন্যের নেয়ামতের দিকে তাকিয়ে আছে।

এমনিভাবে নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য নেই। অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। যদি মানুষ তার উপর মহান আল্লাহ সব সময় যে নেয়ামত নাযিল করছেন, সেটার ধ্যান খেয়াল রাখে, তাহলে অন্যের উপর কখনো হিংসা করতে পারে না। তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, এরপরও আল্লাহ পাক তোমাকে নেয়ামতসমূহের এমন বৃষ্টিতে সিক্ত করেছেন আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নেয়ামতের এমন দরিয়ায় ডুবিয়ে রেখেছেন যে, যদি তুমি সেটার কল্পনা করতে থাক, তাহলে অন্যের নেয়ামতের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কখনো জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হবে না।

সব সময় নিজের থেকে নিচের মানুষের দিকে দেখবে

বর্তমানে আমাদের সমাজে অন্য মানুষের ব্যাপারে খোঁজ-খবর ও অনুসন্ধানের খুব আগ্রহ দেখা যায়। যেমন অমুকের কাছে টাকা কিভাবে আসে? কোথা হতে আসে? কিভাবে সে বাড়ী বানাচ্ছে? কিভাবে গাড়ী ক্রয় করছে? ইত্যাদি প্রতিটা বিষয়ে সমীক্ষা নেয়ার চিন্তা।

পরবর্তীতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল দাঁড়ায় এটাই যে, যদি এমন কোন জিনিস সামনে আসে যেটা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সেটা নিজের কাছে নেই, তাহলে সেটার দ্বারা হিংসা পয়দা হবে না তো কী হবে?

এজন্য ঐ কথাটা মনে রাখবেন যেটা আমি আগেও বলেছি: "দুনিয়ার ব্যাপারে সব সময় নিজের থেকে নিচের মানুষকে দেখবে। আর দ্বীনের ব্যাপারে সব সময় নিজের থেকে উপরের মানুষকে দেখবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এবং শান্তি

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, আমি এক লম্বা সময় পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের মহল্লায় ছিলাম এবং তাদের সাথে

উঠা-বসা করতাম। তো ঐ সময় আমার থেকে বেশি বিষণ্ন আর দুঃখী মানুষ কেউ ছিল না। কেননা যার দিকেই তাকাতাম, দেখতাম যে তার কাপড় আমার কাপড় থেকে উন্নত। তার সওয়ারী আমার সওয়ারী থেকে শ্রেষ্ঠ। তার বাড়ী আমার বাড়ী হতে আরো ভালো। ফলশ্রুতিতে সব সময় এই বিষণ্নতায় ভুগতাম যে, তার তো এসব নেয়ামত হাসিল আছে অথচ আমার নেই। এজন্য আমার থেকে বেশি বিষণ্ন মানুষ আর কেউ ছিল না।

কিন্তু পরবর্তীতে আমি এমন মহল্লায় বসবাস আরম্ভ করি যারা দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্র ও নিম্নস্তরের মানুষ। এদের সাথে আমি উঠাবসা আরম্ভ করি। এর ফলে আমি শান্তি পাওয়া আরম্ভ করি। কেননা এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কারণ যার দিকেই তাকাই দেখি যে, আমার পোষাক তার থেকে উন্নত। আমার সওয়ারী তার সওয়ারী অপেক্ষা উত্তম। আমার বাড়ী তার বাড়ী হতে ভালো। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ আমাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন।

মানুষের চাহিদা কখনোই শেষ হয় না

মনে রাখবেন, কোন মানুষ যদি দুনিয়ার আসবাব জমা করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে, তো এর কোন সীমা পরিসীমা নেই। কবি বলেন:

کار دنیا کسے تمام نہ کرد

অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ কেউ শেষ করে যেতে পারেনি।

এই পৃথিবীতে যিনি সবচেয়ে বেশি ধনী মানুষ, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আপনি কি সবকিছু পেয়েছেন? আপনার কি আর কোন চাওয়া পাওয়া আছে? দেখবেন উত্তরে তিনি এটাই বলবেন যে, আমার তো আরো অনেক কিছু দরকার। অর্থাৎ তারই ফিকির এটাই যে, আমার সম্পদ আরো বাড়ানো দরকার।

আরবী ভাষার বিখ্যাত কবি মুতানাব্বী দুনিয়ার ব্যাপারে দারুণ জ্ঞানগর্ভ একটি কবিতা বলেছেন। সেটা এই–

وَمَا قَضٰى أَحَدٌ مِّنْهَا لَبَانَتَه

وَلَا انْتَهٰى أَرَبٌ إِلَّا إِلٰى أَرَبٍ

অর্থাৎ এ দুনিয়া হতে আজ পর্যন্ত কারো পেট ভরেনি। যখনই কেউ কোন চাহিদা পূরণ করবে, তখনই আরেকটি চাহিদা সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রত্যেক চাহিদা নতুন চাহিদার জন্ম দেয় এবং প্রত্যেক প্রয়োজন এক নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি করে।

এটা আল্লাহ তাআলার বণ্টন

কোন্ পর্যন্ত হিংসা করবেন? অন্যের নেয়ামতসমূহের উপর বিষণ্ন থাকবেন? কেননা এমনটি তো হবেই। কেউ না কেউ নেয়ামতের দিক দিয়ে আপনার চেয়ে অগ্রসর দেখা যাবে। এজন্য সব থেকে বেশি এটা চিন্তা করা দরকার যে, এটা মহান আল্লাহর বণ্টন। আর আল্লাহ তাআলা এসব জিনিস আপন হেকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী বণ্টন করেছেন। এই হেকমত আপনি বুঝতেও পারবেন না। কেননা আমরা অত্যন্ত সীমিত সীমারেখা নিয়ে চিন্তা করি। আমাদের আকল সীমিত, সীমিত আমাদের চিন্তার পরিধি, এই সীমিত বৃত্তের মধ্যেই আমরা চিন্তা-ভাবনা করি অথচ এর বিপরীতে মহান আল্লাহ আপন অসীম হেকমত দিয়ে পুরো জগতকে বেষ্টন করে আছেন। এই ফয়সালা তিনিই করেন যে, কাকে কী দিবেন? কতটুকু দিবেন? কাকে কোন্টা দিবেন না।

ব্যস এভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতার বদস্বভাব দূর হয়ে যাবে।

হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা

এই হিংসা ব্যাধির আরেকটি কার্যকরী চিকিৎসা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, হিংসাকারী এটা চিন্তা করবে, যার ব্যাপারে আমি হিংসা করছি

যে, তার থেকে ঐ নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হোক। কিন্তু ব্যাপার সব সময় বিপরীতটাই ঘটে। ফলশ্রুতিতে যার ব্যাপারে হিংসা করা হয়, তার তো উপকার অবশ্যই হয়। দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। পক্ষান্তরে হিংসুক ব্যক্তির শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

যার ব্যাপারে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়ার ফায়েদা এই যে, যখন তুমি দুনিয়াতে তাকে শত্রু বানিয়ে নিয়েছ তো মূলনীতি এটাই যে, শত্রুর কামনা এটাই থাকে যে, আমার শত্রু সব সময় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকুক। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি হিংসা করবে, দুঃখ কষ্টে লিপ্ত থাকবে। আর এটা ভেবে সে খুশী হতে থাকবে যে, তুমি দুঃখ কষ্টে পতিত আছ।

এটা তো হল তার দুনিয়াবী ফায়েদা। আর আখেরাতের ফায়েদা হচ্ছে এই যে, তুমি তার সাথে যত হিংসা করবে, ততটুকুই তার আমলনামা নেকীর মধ্যে সংযুক্ত হবে। আর যেহেতু সে মাযলূম এজন্য আখেরাতে তার দারাজাত বুলন্দ হবে। আর হিংসার অনিবার্য পরিণতি এই যে, এই হিংসা মানুষকে পরনিন্দা, দোষচর্চা, চোগলখুরী এবং অসংখ্য গুনাহে উদ্ধুদ্ধ করে। যার ফলে খোদ হিংসুক ব্যক্তির নেকীগুলো ঐ মাযলূমের আমলনামায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কেননা যখন তুমি তার গীবত করবে এবং তার জন্য বদ দু'আ করবে, তখন তোমার নেকীগুলো তার আমলনামায় চলে যাবে। যার মানে হল তুমি যতটুকু হিংসা কর, ততটুকুই স্বীয় নেকীসমূহের প্যাকেট প্রস্তুত করে তার কাছে প্রেরণ করছ। যদ্দরূন তার উপকার হচ্ছে।

এখন এই হিংসুক যদি সারাজীবন হিংসা করে, তবে তার সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাবে। আর ঐ মাযলূমের আমলনামা সমৃদ্ধ হবে।

এক বুযুর্গের ঘটনা

কিতাবের মধ্যে জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লেখা হয়েছে যে, একবার এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গের কাছে এসে বলল যে, হযরত! অমুক মানুষ আপনার সমালোচনা করে। এটা শুনে ঐ বুযুর্গ নীরব হয়ে গেলেন।

কোন উত্তর দিলেন না। যখন মজলিস খতম হল, তখন তিনি নিজ বাসায় চলে আসলেন এবং যে লোকটি তাঁর সমালোচনা করছিল তার জন্য বিশাল বড় একটি হাদিয়া প্রস্তুত করে তার বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

লোকেরা বলল, হযরত! সে তো আপনার সমালোচনা করে অথচ তার কাছেই কিনা আপনি হাদিয়া পাঠালেন? বুযুর্গ বললেন: আরে সে তো আমার উপর অনুগ্রহকারী। কেননা সে আমার দোষচর্চা করে আমার নেকী বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই সে তো আমার উপর অনুগ্রহ করেছে। এজন্য আমি তার অনুগ্রহের সামান্য বদলা দিতে চেয়েছি। যেহেতু সে আমার আখেরাতের নেকীসমূহ বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি চাইলাম কমপক্ষে দুনিয়াতেই তাকে সামান্য হাদিয়া দিয়ে দেই।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর গীবত হতে সতর্কতা

আর এটা একটা প্রসিদ্ধ কথা যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. এর মজলিসে কোন ব্যক্তি কারো গীবত করতে পারত না। কেননা তিনি না তো কারো গীবত করতেন আর না কারো গীবত শুনতেন। তাঁর মজলিস সব সময় গীবতমুক্ত হত।

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ শিষ্যদের মজলিসে গীবত ও হিংসার ক্ষতি বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে এটা বুঝানোর জন্য যে, গীবতের দ্বারা নেকীসমূহ নষ্ট হয়ে যায়। বলছিলেন যে, এ গীবত এমনই এক জিনিস যা গীবতকারীর নেকীসমূহকে ঐ ব্যক্তির দিকে স্থানান্তরিত করে দেয় যার গীবত করা হয়েছে। এ জন্য আমি কখনো গীবত করিনা। কিন্তু আমার অন্তরে যদি কখনো এই খেয়াল আসে যে, আমি কারো গীবত করব, তো ঐ সময় আমি আমার মা-বাবার গীবত করব। কেননা যদি গীবতের পরিণামে আমার নেকীসমূহ নষ্ট হয়ে যায়, তো মা বাবার আমলনামায় যাবে। কিন্তু ঘরের জিনিস ঘরে থাকবে। বাইরের কারো কাছে যাবে না।

তো হযরত ইমামে আযম রহ. এদিকে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, এই গীবত ও হিংসাকারী নিজের অন্তরে তো অন্যের ক্ষতি কামনা করছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের উপকার পৌঁছাচ্ছে এবং নিজেই নিজের সর্বনাশ করছে। এজন্য এই গীবত ও হিংসা কতইনা নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আরেকটি ঘটনা

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সমকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ। উভয়ে একই যুগের মানুষ। আর উভয়েরই স্ব স্ব হালকায়ে দরস ছিল।

একদিন হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. এর নিকট কেউ একজন জিজ্ঞেস করল যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? উত্তরে হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, তিনি খুব কৃপণ মানুষ। তখন ঐ ব্যক্তি বলল যে, আমরা তো তাঁর ব্যাপারে শুনেছি যে, তিনি অত্যন্ত দানশীল মানুষ। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, তিনি এতই কৃপণ যে, নিজের নেকী কাউকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নন। অথচ অন্যের নেকীসমূহ তিনি খুব নিতে থাকেন। সেটা এভাবে যে, মানুষ তাঁর খুব গীবত করতে থাকে এবং তাঁর বদনাম করতে থাকে। যদ্দরূন মানুষের নেকীসমূহ তাঁর আমলনামায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারো গীবত করেন না এবং শুনেন না। এজন্য স্বীয় নেকীসমূহ কাউকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নন। এ কারণেই আখেরাত এর দৃষ্টিকোণে তাঁর থেকে অধিক কৃপণ মানুষ আর কেউ নেই।

বাস্তব কথা হল, যার সাথে হিংসা করা হয় অথবা যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয় অথবা যার গীবত করা হয় সত্য কথা হল হিংসুক এবং গীবতকারী নিজ নেকীসমূহের প্যাকেট বানিয়ে বানিয়ে ঐ ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করছে আর নিজেই রিক্তহস্ত হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি কে?

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আচ্ছা বলতো নিঃস্ব কোন্ ব্যক্তি? সাহাবায়ে কিরাম রাযি. আরয করলেন, নিঃস্ব তো হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে টাকা-পয়সা নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এ লোক প্রকৃত নিঃস্ব নয়। বরং প্রকৃত নিঃস্ব হল ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় আমলনামায় প্রচুর নেকী, অসংখ্য নামায ও রোযা, অনেক যিকির আযকার ও তাসবীহাত নিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিবে। কিন্তু যখন কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট হিসাব কিতাবের জন্য হাযির হবে, তখন সেখানে মানুষের ভীড় লেগে যাবে। একজন বলবেঃ এই লোক আমার ঐ হক নষ্ট করেছিল। আরেকজন বলবেঃ সে আমাকে অমুক পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। এভাবে তৃতীয়জন, চতুর্থজন।

এখন আখেরাতের কারেন্সী এই নোট তো আর হবে না যে, সেগুলো দিয়ে হক পুরো করে দিবে। সেখানের কারেন্সী হল নেকীসমূহ। তাইতো আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন যে, ঐসব মানুষের হকসমূহের বদলায় এ লোকের নেকীগুলো দিয়ে দেয়া হোক।

এখন কেউ তার নামায নিয়ে চলে যাবে, কেউ নিয়ে যাবে রোযা, কেউ নিয়ে যাবে তার যিকর আযকার। এভাবে তার সমস্ত নেকী খতম হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের হক পুরা হবে না। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ বলবেনঃ যখন তার নেকীসমূহ শেষ হয়ে গেছে, তো হকওয়ালা বা পাওনাদারদের গুনাহগুলো তার আমলনামায় দিয়ে তাদের হকসমূহ আদায় করো।

পরিণতি হল এটাই যে, যখন সে এসেছিল, তখন তার আমলনামা নেকীর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আর যখন ফেরত যাচ্ছে, তখন শুধু এতটুকু নয় যে, হাতখালী বরং গুনাহের বোঝা নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছে। এই লোকটাই হল প্রকৃত নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত ব্যক্তি।

যাই হোক, হিংসার দ্বারা এভাবে নেকীসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়।[৫]

যদি আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কাউকে আয়নার মত স্বচ্ছ একটি অন্তর দান করেন, যার মধ্যে না আছে হিংসা, না আছে বিদ্বেষ, বা কারো প্রতি গীবত। তো এমতাবস্থায় যদি তার আমলনামায় অনেক বেশি নফল এবং অনেক বেশি যিকর-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল নাও থাকে কিন্তু তার অন্তরটা আয়নার মত পরিস্কার হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা এত বেশি বাড়িয়ে দেন যার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

জান্নাতের সুসংবাদ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন: একবার আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন যে ব্যক্তি মসজিদের ঐপাশ দিয়ে প্রবেশ করবে সে জান্নাতী। আমরা ঐদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তো কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এমনভাবে প্রবেশ করলেন যে, তার চেহারা হতে উযূর পানি টপকাচ্ছিল। আর তিনি বাম হাতে জুতা বহন করছিলেন। তাঁর ব্যাপারে আমাদের দারুণ ঈর্ষা হল। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, যখন মজলিস খতম হল, তখন আমার অন্তরে খেয়াল আসল যে, আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখব যে, তাঁর কোন্ আমলটি এমন যেটার ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্বের সাথে তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

---

৫. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৫৩৩

ফলশ্রুতিতে যখন তিনি নিজ বাসায় যেতে উদ্যত হলেন, তখন আমিও তাঁর পিছে পিছে চলতে লাগলাম আর রাস্তায় তাঁকে বললাম যে, আমি দুই তিন দিন আপনার বাসায় থাকার অনুমতি চাই। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি তাঁর ঘরে চলে গেলাম। যখন রাত হল এবং তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, তখন আমি সারারাত বিছানায় শুয়ে জেগে থাকলাম। ঘুমালাম না, এটা দেখার জন্য যে, রাত্রে তিনি ঘুম থেকে উঠে কী আমল করেন? কিন্তু সারা রাত পার হয়ে গেল। তিনি ঘুম ছেড়ে উঠলেনই না। পড়ে পড়ে ঘুমালেন। তাহাজ্জুদের নামাযও পড়লেন না। ফজরের সময় উঠলেন। এরপর দিনেও আমি তাঁর কাছে কাটালাম। তো দেখলাম যে, পুরো দিনেও তিনি বিশেষ কোন আমল করেননি। না নফল, না যিকর আযকার, না তাসবীহ, না তিলাওয়াত। ব্যস যখন নামাযের সময় হত, তখন মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে নিতেন। যখন দুই তিনদিন আমি সেখানে থেকে দেখে নিলাম যে, ইনিতো বিশেষ কোন আমলই করেন না। শুধু ফরয ওয়াজিবগুলো যথাযথভাবে আদায় করেন আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। তখন তিনি বললেন যে, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এ সুসংবাদ দিয়ে থাকেন তবে সেটা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমার দ্বারা তো কোন আমল হয় না। আর আমি নফল নামাযও বেশি পড়তে পারিনা। কিন্তু একটা কথা। সেটা হল আমার অন্তরে কারো ব্যাপারে কোন হিংসা বা বিদ্বেষ নেই। সম্ভবত এ কারণে মহান আল্লাহ আমাকে এ সুসংবাদের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন।[৬]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ মহা সৌভাগ্যবান মানুষটি ছিলেন হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি.। যিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ তথা পৃথিবীর বুকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে একজন।

৬. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৬১৮৩

তার উপকার, আমার ক্ষতি

যাই হোক, আপনি দেখলেন যে, এসব আমলের মধ্যে খুব বেশি নফল, যিকর-আযকার কিন্তু নেই। কিন্তু অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত। দিল আয়নার মত স্বচ্ছ। তো হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা হল এই যে, মানুষ এটা চিন্তা করবে যে, আমি যার সাথে হিংসা করছি, এই হিংসার ফলে তার তো উপকার হবে, কিন্তু আমার তো ক্ষতি। এভাবে চিন্তা করলেও এ ব্যাধি হ্রাস পায়।

হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা

যেমনটি আমি আরয করেছি যে, হিংসার ভিত্তি হল দুনিয়ার মহব্বত ও পদের মোহ। এজন্য এই হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা হল, মানুষ নিজের অন্তর হতে দুনিয়া ও পদের মোহ বের করার চিন্তা করবে। কেননা সমস্ত ব্যাধির মূল হল দুনিয়ার মহব্বত। আর এই দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে বের করার পদ্ধতি হল, মানুষ এটা চিন্তা করবে যে, দুনিয়া কয়দিনের? যে কোন সময় চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের মুক্তির কোন পথ থাকবে না। দুনিয়ার স্বাদ, দুনিয়ার নেয়ামত, এর সম্পদ, এর সুখ্যাতি ও সম্মান এবং এসবের অস্থায়ীত্বের ব্যাপারে মানুষের চিন্তা করা উচিত। আর ভাবা উচিত যে, যে কোন সময় মৃত্যু চলে আসবে তো সমস্ত কাহিনী খতম হয়ে যাবে।

যাই হোক, এ তিনটি জিনিস যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং এগুলো মনের মধ্যে হাযির থাকলে এই ব্যাধি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হিংসা দু'প্রকার

আরেকটি কথা বুঝে নিন। এটা বুঝা খুব জরুরী। সেটা হচ্ছে এই যে, হিংসার খারাবীসমূহ শোনার পর অনেক সময় মনের মধ্যে এমন খেয়াল আসে যে, এই ব্যাধিটাতো এমন যে, অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেও এটা সৃষ্টি হয়ে যায়। বিশেষত আমরা আমাদের

সমবয়সী, সমমর্যাদাবান, সহপাঠী বা সহপেশার লোকদের মধ্যে কাউকে অগ্রসর বা উন্নতি করতে দেখলে গাইরে ইখতিয়ারীভাবে অন্তরে এই খেয়াল আসে যে, আচ্ছা এতো আমার থেকে আগে বেড়ে গেল। অতঃপর অন্তরে অবচেতন ভাবেই একটা বেদনা ও বিষণ্নতার ভাব চলে আসে।

এখন ব্যাপার হল, এটার তো ইচ্ছা ছিলনা বা নিজ ইখতিয়ারেও অন্তরে আনা হয়নি। বরং গাইরে ইখতিয়ারী বা অবচেতনভাবে মনে খেয়াল এসে গেছে। এর থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? এর থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি কি?

খুব বুঝে নিন। হিংসার একটা পর্যায় তো হল কোন মানুষের অন্তরে এই খেয়াল আসল যে, অমুক ব্যক্তি যে নেয়ামত পেয়েছে সেটা যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু এই খেয়ালের পাশাপাশি হিংসাকারী নিজের কথা ও কাজের দ্বারা তার অমঙ্গলও কামনা করে। উদাহরণস্বরূপ মজলিসে বসে তার দোষচর্চা করে, তার গীবত করে, যাতে করে ঐ নেয়ামতের কারণে মানুষের অন্তরে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা শেষ হয়ে যায়। অথবা সে এই চেষ্টা করছে যেন তার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

এমন হিংসা সম্পূর্ণ হারাম। এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, অন্যের নেয়ামত দেখে তার অন্তরে কষ্ট লাগে। আর এই খেয়াল আসে যে, সে এই নেয়ামত কেন পেল? কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিজ কথা বা কাজ, আচার-আচরণ দ্বারা এই হিংসার ব্যাপারটা অন্যের সামনে প্রকাশ করে না। ঐ লোকের সমালোচনা বা গীবতও করে না। তার অমঙ্গলও কামনা করে না আর তার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার কোন অপচেষ্টাও সে চালায়না। ব্যস অন্তরে শুধু একটি দুঃখ ও ব্যথা যে, সে এই নেয়ামত কেন পেল?

বাস্তবিক পক্ষে তো এটাও হিংসা ও গুনাহ। কিন্তু এর চিকিৎসা সহজ। আর সামান্য মনোযোগী হলে এই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করবে

এর চিকিৎসা হল, যখন অন্তরে এই জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে একথা চিন্তা করবে যে, এই হিংসা কত মারাত্মক জিনিস। আর আমার অন্তরে এই যে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হচ্ছে, এটা খুবই খারাপ কাজ। আর যখন এ জাতীয় খেয়াল অন্তরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার পড়বে আর এটা চিন্তা করবে যে, নফস ও শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করছে। এটা আমার জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। এজন্য যখনই হিংসার খেয়াল আসে, তখনই হিংসার ধ্বংসলীলার খেয়ালও অন্তরে নিয়ে আসবে। তাহলে এই হিংসার গুনাহ খতম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তার ব্যাপারে দু'আ করবে

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন যে, যদি অন্তরে অন্যের নেয়ামত দেখে হিংসা ও জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, তাহলে এটার একটি চিকিৎসা এটাও আছে যে, নির্জনে বসে মহান আল্লাহর কাছে তার ব্যাপারে দু'আ করবে "হে আল্লাহ! এই যে নেয়ামত আপনি তাকে দান করেছেন আরো বাড়িয়ে দিন। যে সময় সে দু'আ করবে তখন তো তার অন্তরে করাত চলবে। আর এই দু'আর দ্বারা অন্তরে প্রচন্ড চাপ পড়বে। কিন্তু তারপরও ইচ্ছার বিপরীত মনের উপর চাপ প্রয়োগ করে দু'আ করবে। হে আল্লাহ! আপনি তাকে আরো উন্নতি দান করুন। তার নেয়ামতে আরো বরকত দান করুন।

আর এর পাশাপাশি নিজের জন্যও এই দু'আ করবে যে, ইয়া আল্লাহ! আমার অন্তরে তার নেয়ামতের কারণে যে কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে নিজ অনুগ্রহে সেটা দূর করে দিন।

সারকথা হল এই তিনটি কাজ করবে। একটি হল নিজ অন্তরে যে কষ্ট পয়দা হচ্ছে আর তার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার যে খেয়াল অন্তরে জাগছে সেটাকে অন্তর থেকেই খারাপ মনে করবে। দ্বিতীয়ত

তার জন্য কল্যাণের দু'আ করবে। তৃতীয়ত নিজের জন্য দু'আ করবে, "হে আল্লাহ! আমার দিল হতে এটা দূর করে দিন।"

এই তিনটি কাজ করার পরও যদি অন্তরে অবচেতনভাবে খারাপ খেয়াল আসে, তাহলে আশা করা যায় যে, মহান আল্লাহর শাহী দরবারে পাকড়াও হবে না। ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি অন্তরে খারাপ খেয়াল আসতেই থাকে অথচ সে এই খেয়ালকে খারাপ মনে করে না অথবা সেটা থেকে পরিত্রাণ লাভের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে না, তাহলে কিন্তু গুনাহ হবে।

হক নষ্ট করার ব্যাখ্যা

এ মাসআলাটি আমি বহুবার বলেছি যে, যে সব গুনাহের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হকের সাথে, ঐসব গুনাহের চিকিৎসা তো সহজ যে, মানুষ তাওবা ও ইসতিগফার করে নিবে। ঐ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যেসব ত্রুটি ও গুনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে, সেগুলো শুধুমাত্র তাওবা করার দ্বারা মাফ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হকওয়ালা মাফ না করে বা তার দ্বারা মাফ করানো না হবে। ঐ সময় পর্যন্ত মাফ হবে না।

হিংসার ব্যাপার হল এই যে, যদি এটাকে আপনি আপনার মুখে নিয়ে আসেন আর ঐ হিংসার বশবর্তী হয়ে আপনি গীবত করে বসেন অথবা তার অমঙ্গল কামনায় কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন, তাহলে এমতাবস্থায় হিংসার সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে হয়ে যাবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মাফ না করবে, এই গুনাহ মাফ হবে না।

কিন্তু যদি হিংসা শুধু অন্তরেই থাকে, মুখে তার সমালোচনায় বা গীবত হিসেবে কিছু না বলে এবং তার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ হিংসার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হকের সাথে। এ কারণে ঐ গুনাহটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ চাওয়া ব্যতীত শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে।

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হিংসা অন্তরে আছে, মানুষ চিন্তা করবে যে, এখনো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণে আছে। সহজভাবে এর সমাধান হতে পারে। আর মাফ চাওয়াও সহজ। নতুবা যদি এটা আগে বেড়ে যায়। তাহলে বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। পরে আর মাফের কোন পথ থাকবে না।

অধিক ঈর্ষা করাও ভাল নয়

যেমনটি আমি আরয করেছি যে, যদি অন্যের নেয়ামত ছিনতাই হওয়ার ইচ্ছা অন্তরে না থাকে বরং শুধু এই খেয়াল হয় যে, এ নেয়ামত আমারও হাসিল হোক। তো যদিও এটা হিংসা নয় বরং ঈর্ষা। কিন্তু এটা বেশি বেশি মনে আনা ও চিন্তা করা শেষ পর্যন্ত মানুষকে হিংসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

এজন্য যদি দুনিয়ার মাল দৌলতের কারণে কারো উপর ঈর্ষা চলে আসে, তাহলে এটাও কোন ভাল কথা নয়। কেননা এই ঈর্ষাই অনেক সময় অন্তরে মাল দৌলতের লোভ সৃষ্টি করে দেয়। আবার অনেক সময় এই ঈর্ষা সামনে অগ্রসর হয়ে হিংসায় পরিণত হয়।

দ্বীনের কারণে ঈর্ষা করা ভালো

কিন্তু যদি দ্বীনদারীর কারণে ঈর্ষা সৃষ্টি হয় তো এটা তো ভালো কথা। কেননা হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

অর্থাৎ "হিংসা জায়িয নেই কিন্তু শুধুমাত্র দু'জন মানুষের ক্ষেত্রে জায়িয। (এখানে "হিংসা" দ্বারা "ঈর্ষা" উদ্দেশ্য) একজন হলেন ঐ মানুষ যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন আর তিনি সেটাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। আর অপরজন হলেন ঐ ব্যক্তি যাকে

আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন আর তিনি ঐ ইলমের মাধ্যমে মানুষদেরকে উপকার পৌঁছাচ্ছেন ও দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছেন।"[৭]

এজন্য যদি দ্বীনের কারণে কেউ ঈর্ষা করে যে, অমুক ব্যক্তি দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে আমার থেকেও আগে বেড়ে গেছে। তাহলে সেই ঈর্ষা পছন্দনীয় এবং খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার।

দুনিয়ার জন্য ঈর্ষা পছন্দনীয় নয়

কিন্তু দুনিয়ার মাল দৌলতের কারণে অন্যের উপর ঈর্ষা করা যে, অমুকের কাছে সম্পদ বেশি আছে, দৌলত বেশি আছে, তার প্রসিদ্ধি বেশি, সম্মান বেশি, এসব দুনিয়াবী জিনিসেও ঈর্ষা করা পছন্দনীয় নয়। কেননা এসব জিনিসে বেশি সন্দেহের কারণে লোভ সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে হিংসা পয়দা হওয়ারও আশংকা আছে। এজন্য এই ঈর্ষাকেও বেশি বাড়তে দেয়া যাবে না। বরং যখন এ জাতীয় খেয়াল মনের মধ্যে আসবে, তখন মানুষ চিন্তা করবে যে, যদি অমুক নেয়ামত তার কাছে থেকে থাকে তাহলে কী অসুবিধা? আল্লাহ পাক তো আমাকেও অনেক নেয়ামত দান করেছেন। যা তার কাছে নেই। আর যে সব নেয়ামত আমি পাইনি, নিশ্চয়ই সেগুলো না পাওয়ার মধ্যেই আমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে। ঐসব নেয়ামত আমার কাছে থাকলে না জানি কোন্ মুসীবতে আমি ফেঁসে যেতাম।

যাই হোক, এসব কথা চিন্তা করবে এবং এই ঈর্ষার খেয়াল কেও নিজ অন্তর হতে বের করার চেষ্টা করবে। হিংসার ব্যাপারে এ কয়টা কথা আমি আপনাদের খেদমতে আরয করলাম।

আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে আমাদেরকে এর বাস্তবতা অনুধাবন করার তাউফীক দান করুন এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচার তাউফীক দান করুন। আমীন।

---

৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৭৩

শাইখ এবং মুরব্বীর প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু যেমনটি আমি বারবার আরয করতে থাকি যে, অন্তরের যতগুলো রোগ আছে, সেগুলো থেকে বাঁচার প্রকৃত চিকিৎসা হল এই যে, কোন রূহানী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে।

যদি শারীরিক রোগের কোন ডাক্তার একবার রোগীকে নিজের কাছে বসিয়ে খুব ভালভাবে এটা বলে দেয় যে, জ্বরের হাকীকত কি? এর বাস্তবতা কি? এর কারণ বা উপলক্ষই বা কি কি? এর চিকিৎসা ও ঔষধসমূহ কি কি? ইত্যাদি। কিন্তু যখন তার জ্বর আসবে তখন কি সে ডাক্তার সাহেবের বাতলানো কথাগুলোকে স্মরণ করে সে অনুযায়ী নিজের চিকিৎসা নিজেই আরম্ভ করবে? বলা বাহুল্য যে, সে এমনটি করবে না। কেননা অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অনেক সময় ঔষধসমূহ নিজের জন্য ফিট করার ক্ষেত্রে ভুলও হয়ে যায়। এজন্য কোন ডাক্তার বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

অনুরূপভাবে অন্তরের যে ব্যাধিগুলো আছে, উদাহরণস্বরূপ রিয়াকারী বা মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করা হিংসা বা বিদ্বেষ, তাকাব্বুর বা অহংকার ইত্যাদি। আপনারা এগুলোর বাস্তবতা তো শুনে ফেলেছেন। কিন্তু যখন কেউ এ জাতীয় কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, তখন তার উচিত হবে এমন কোন রূহানী ডাক্তার বা আত্মার রোগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, যিনি নিজের চিকিৎসা করিয়েছেন এবং অন্যের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে পারদর্শী ব্যক্তি। তাকে বলতে হবে যে, হযরত! আমার অন্তরে বিভিন্ন খারাপ খেয়াল ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। এর সমাধান কি? এরপর ঐ বুযুর্গ সঠিক ব্যবস্থাপত্র দেন।

অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ নিজেকে রোগী মনে করে, কিন্তু বাস্তবে সে রোগী নয়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ নিজেকে সুস্থ মনে করে কিন্তু বাস্তবে সে হল অসুস্থ। আবার অনেক সময় এমন হয় যে, তার জন্য কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপত্র উপকারী কিন্তু দেখা যায় যে, সে অন্য কোন চিকিৎসা গ্রহণ করছে!!

এজন্য বুনিয়াদী কথা হল এই যে, কোন অনুমতিপ্রাপ্ত আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের কাছে রুজু করে তাঁকে নিজের ভেতরগত অবস্থা বিস্তারিত জানাবে। অতঃপর তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্র বা চিকিৎসা অনুযায়ী আমল করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

غصّے کو قابو میں کیجئے

গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন

বাদ হামদ ও সালাত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ قَالَ: لَا تَغْضَبْ.

"হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন উপদেশ দিন তবে লম্বা উপদেশ দিবেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: গোস্বা করবে না।"[৮]

আগন্তুক সাহাবী উপদেশ প্রদানের দরখাস্ত করেছেন। পাশাপাশি শর্ত আরোপ করেছেন যেন ঐ উপদেশ সংক্ষিপ্ত হয়। লম্বা চওড়া না হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ শর্তের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি যে, উপদেশ চাও আবার সংক্ষেপ করতে বল। এ কারণেই এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম লিখেছেন: যে ব্যক্তি উপদেশপ্রার্থী, সে যদি একথা বলে যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করুন। তাহলে সেটা আদব পরিপন্থী হবে না। কারণ হতে পারে সে মানুষটির তাড়াহুড়ো আছে। যদ্দরুন তিনি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করছেন। এখন যদি আপনি তার সামনে লম্বা উপদেশ প্রদান শুরু করেন, তাহলে ঐ বেচারা পেরেশানীতে পড়ে যাবে।

---

৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১১৬

তো যাই হোক, এটা আদব পরিপন্থী কোন কাজ নয়। তাইতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করে বলেছেন: لَا تَغْضَبْ "তুমি গোস্বা করনা"।

যদি মানুষ এই সংক্ষিপ্ত উপদেশের উপর আমল করে তাহলে সম্ভবত শত সহস্র গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

গুনাহের দু'টি উপলক্ষ: গোস্বা ও কু-প্রবৃত্তি

কেননা দুনিয়াতে যত গুনাহ হয় চাই সেটা মহান আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট হোক বা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হোক। মানুষ চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, এসব গুনাহের নেপথ্যে দু'টি স্পৃহা কাজ করে। একটি হল "গোস্বা"। আর অপরটি হল خواهش نفس বা মনের মন্দবাসনা। উদাহরণস্বরূপ: বেশি খাওয়ার বাসনা চুরি করার বাসনা, বারবার গুনাহ করার বাসনা, ডাকাতি করার বাসনা, কুদৃষ্টি করার বাসনা ইত্যাদি।

বুঝা গেল যে, অনেক গুনাহ মানুষ করে মনের মন্দ বাসনার তাড়নায় তাড়িত হয়ে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, অসংখ্য গুনাহ আছে যেগুলো মন্দ বাসনার তাড়নায় সৃষ্টি হয়। আবার অনেক গুনাহ আছে যেগুলো গোস্বার দ্বারা পয়দা হয়। এখনই আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা ইনশাআল্লাহ। এর দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এই গোস্বা কত বড় বড় গুনাহের জনক। কাজেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যে কথাটি বললেন, "গোস্বা করো না" যদি মানুষ এই একটি উপদেশের উপর আমল করে, তো এর ফলে অর্ধেক গুনাহ খতম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন: এই হাদীসের বিষয়বস্তু অর্থাৎ গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সুলূক ও তরীকতের এক বিশাল অধ্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলতে চায় এবং নিজের সংশোধন

করতে চায়, তার প্রথম করণীয় কাজ হল গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফিকির করা।

"গোস্বা" একটি প্রকৃতিগত জিনিস

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই "গোস্বা" বা রাগ রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন মানুষ এমন নাই যার মধ্যে গোস্বার প্রকৃতি নাই। মহান আল্লাহ নিজ হেকমতের কারণেই এই প্রকৃতি ও স্বভাব মানুষের মধ্যে রেখেছেন। এই স্বভাবটাকেই যদি মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তাহলে এটাই মানুষকে অগণিত বালা-মুসীবত থেকে সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম হয়ে যায়।

যদি মানুষের মধ্যে এই রাগের স্বভাব না থাকে, তাহলে কোন শত্রু যদি তার উপর আক্রমণ করে তবুও তার রাগ বা গোস্বাও আসবে না। অথবা কোন হিংস্র প্রাণী তার উপর হামলা করলেও তার কোন গোস্বাই আসবে না। এমনকি সে আত্মরক্ষাও করতে পারবে না। এজন্য বৈধ আত্মরক্ষার জন্য গোস্বার ব্যবহার জায়িয আছে। শরীয়ত এ ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেনি। কেননা গোস্বা তো দেয়াই হয়েছে এজন্য যেন সে মানুষ স্বীয় জান-মাল হেফাযত করতে পারে। নিজ স্ত্রী-সন্তানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে প্রতিহত করতে পারে। এগুলো হল গোস্বার বৈধ ক্ষেত্রসমূহ।

গোস্বার ফলে সৃষ্ট গুনাহসমূহ

কিন্তু যদি এই গোস্বাই নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তাহলে এর পরিণামে যে গুনাহ সৃষ্টি হয় সেগুলোর সংখ্যা অনেক।

তাইতো গোস্বার দ্বারাই "অহংকার" সৃষ্টি হয়, গোস্বার কারণেই "হিংসা" সৃষ্টি হয়। গোস্বার ফলেই "বিদ্বেষ" সৃষ্টি হয়, গোস্বার দরূনই "শত্রুতা" সৃষ্টি হয়। এগুলো ছাড়াও না জানি কত খারাবী এই গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়। যদি এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে না থাকে, উদাহরণস্বরূপ

যদি গোস্বা কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণে না থাকে আর সেই গোস্বা কোন মানুষের উপর এসে যায়, এখন যার উপর গোস্বা এসেছে সে নিয়ন্ত্রণে আছে। উদাহরণস্বরূপ সে অধীনস্ত, তাহলে এই গোস্বার ফলে হয়ত তাকে কষ্ট দিবে অথবা মারবে অথবা ধমক দিবে কিংবা গালি দিবে বা সমালোচনা করবে বা মনে ব্যথা দিবে ইত্যাদি।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই প্রত্যেকটি কাজ গুনাহ। যা গোস্বার ফলে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কেননা অন্যকে অন্যায়ভাবে মারপিট করা মারাত্মক গুনাহ। অনুরূপভাবে যদি গোস্বার কারণে কাউকে গালি দিয়ে দেয়। তো হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন سباب المسلم فسوق وقتاله كفر অর্থাৎ "কোন মুসলমানকে গালি দেয়া নিকৃষ্টতম ফাসেকী কাজ, আর তাকে হত্যা করা কুফরী কাজ।"[৯]

অনুরূপভাবে যদি গোস্বার কারণে অন্যের সমালোচনা বা নিন্দাবাদ করে, যদ্দরূন অন্য মানুষের অন্তর ভেঙ্গে যায়, তাহলে এটাও অনেক বড় গুনাহ। এই সব গুনাহ ঐ সময় হয়েছে যখন এমন ব্যক্তির উপর গোস্বা এসেছে যিনি আপনার অধীনস্ত ছিলেন।

"বিদ্বেষ" গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়

আর যদি এমন কারো উপর গোস্বা এসে যায় যিনি আপনার অধীনস্ত নন এবং তিনি আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই, তাহলে তো গোস্বার ফলে আপনি তার গীবত করবেন। উদাহরণস্বরূপ যার উপর গোস্বা এসেছে তিনি আপনার থেকে যে কোন দিক দিয়ে বড় এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তার সামনে কিছু বলার সাহস আপনার নেই, মুখ খুলেনা। ফলশ্রুতিতে যেটা হবে সেটা হল আপনি তার সামনে তো চুপ থাকবেন ঠিক, কিন্তু যখন তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবেন, তখন তার বদনাম গাওয়া আরম্ভ করে দিবেন। আর তার গীবত করতে থাকবেন।

৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮

এখন এই যে গীবত হচ্ছে কিসের কারণে হচ্ছে? ঐ গোস্বার কারণে। আবার অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ অন্যের যত গীবতই করুক, তবুও তার গোস্বা ঠান্ডা হয় না বরং গোস্বার কারণে মনে চায় যে, তার চেহারা খামচে ধরি। তাকে কষ্ট দেই। কিন্তু যেহেতু সে প্রভাবশালী ও বড়, এজন্য তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। এর ফলে অন্তরে এক মারাত্মক ক্ষোভ জন্ম নেয়। সেই ক্ষোভের নামই হল "বিদ্বেষ"।

এখন মনের মধ্যে সব সময় এ চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, যদি সুযোগ হয়, তাহলে তাকে কষ্ট দিব। আর যদি আপনা আপনি তার কোন বিপদ আসে তাহলে খুশী হয় যে, ভালই হয়েছে যে, তার কষ্ট হচ্ছে, বিপদ এসেছে। এটাই "বিদ্বেষ"। যা স্বতন্ত্র একটি গুনাহ। যা ঐ গোস্বার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

"হিংসা" গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়

আর যদি যে ব্যক্তির উপর গোস্বা আসবে তার কষ্ট পাওয়ার পরিবর্তে আরাম ও খুশী হাসিল হয়ে যায়। যেমন কোন স্থান হতে সে মোটা অংকের টাকা পেয়ে গেল অথবা সে কোন বড় পদমর্যাদার অধিকারী হয়ে গেল, তো এখন অন্তরে এই চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে যে, এই পদমর্যাদা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। এই ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা যে কোন ভাবেই যেন তার কাছে নষ্ট হয়ে যায়। এটার নামই হল "হিংসা"। এই "হিংসাও" ঐ গোস্বার ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক, যার উপর গোস্বা আসছে যদি তার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলেও অনেক গুনাহ এর দ্বারা প্রকাশ পায়, আর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবুও অনেক গুনাহ প্রকাশ পায়। এই সব গুনাহ ঐ "গোস্বা" নিয়ন্ত্রণে না থাকার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে। যদি গোস্বা নিয়ন্ত্রণে থাকত, তাহলে মানুষ এই সব গুনাহ হতে নিরাপদ থাকত। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন لَا تَغْضَبْ "গোস্বা করোনা"।

তাইতো কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নেক মুসলমানদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ

অর্থাৎ "নেক মুসলমান হলেন তারা যারা গোস্বাকে সংবরণ করেন আর মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেন।"[১০]

গোস্বার ফলে বান্দার হকসমূহ নষ্ট হয়

যেমনটি আমি আরয করেছি যে, গুনাহের উৎসমূল হল দুটি জিনিস। একটি হল গোস্বা। অপরটি হল মনের মন্দ বাসনা। কিন্তু মন্দ বাসনার তাড়নায় যে গুনাহ সংঘটিত হয়, সেটা যদিও বড় মারাত্মক কিন্তু সেই গুনাহও খালেস দিলে তাওবা করলে মহান আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন এবং তার তাওবা কবূল করে নেন। শুধু তাই নয় বরং তার আমলনামা হতে ঐ গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।

কিন্তু গোস্বার ফলে যে গুনাহ সংঘটিত হয়, সেগুলোর বেশিরভাগের সম্পর্ক হল বান্দার হকের সাথে। উদাহরণস্বরূপ গোস্বার ফলে কাউকে মারল বা বকা দিল বা কারো মনে ব্যথা দিল বা কারো সমালোচনা করল ইত্যাদি। এসবের সম্পর্ক হল বান্দার হকের সাথে।

অনুরূপভাবে যদি গোস্বার ফলে কারো গীবত করে অথবা কারো সাথে "বিদ্বেষ" রাখে বা কারো সাথে "হিংসা" সৃষ্টি হয়, তো এ সবও বান্দার হক নষ্ট করা। অতএব গোস্বার ফলে যত গুনাহ হয়, সবগুলোর সম্পর্ক হল বান্দা বা বান্দীর হকের সাথে। আর বান্দার হক নষ্ট করা এমন মারাত্মক একটি গুনাহ যে, যদি পরবর্তীতে মানুষ এর থেকে ফিরেও আসে এবং তাওবা করে নেয়, তবুও তার তাওবা ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যে বান্দার হক নষ্ট করেছে, সে মাফ না করবে। অতক্ষণ পর্যন্ত ঐ গুনাহ মাফ হবে না।

---

১০. সূরা আলে ইমরান: ১৩৪

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: তাওবা করলে আমি আমার হক তো অবশ্যই মাফ করব কিন্তু আমার বান্দাগণের যে সব হক তোমরা নষ্ট করেছ, সেগুলো আমি অতক্ষণ পর্যন্ত মাফ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দাদের থেকে মাফ করিয়ে না নিবে।

এখন তুমি কার কার কাছে মাফের জন্য ছুটাছুটি করবে? এজন্য বান্দার হক নষ্ট করা বড় মারাত্মক গুনাহ। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভমূলক উপদেশ প্রদান করে বলেছেন: لَا تَغْضَبْ "গোস্বা করবে না"।

যখন মানুষ স্বীয় গোস্বার উপর কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তখন মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: যখন আমার বান্দা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তো এখন আমিও তার সাথে গোস্বাসুলভ আচরণ করব না।

গোস্বা না করার উপর বিশাল প্রতিদান

একটি হাদীস শরীফের ভাবার্থ এমন, কিয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর সামনে এক ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন: বলো এর আমলনামায় কী কী নেকী আছে? অথচ আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। কিন্তু অনেক সময় অন্যদের সামনে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ পাক প্রশ্নও করেন।

উত্তরে ফেরেশতাগণ বলবেন যে, ইয়া আল্লাহ! তার আমলনামায় খুব বেশি নেকী তো নেই। সে না তো নফল নামায বেশি পড়েছে আর না তো ইবাদত বেশি করেছে। কিন্তু তার আমলনামায় একটি বিশেষ নেকী এই যে, যখন কোন ব্যক্তি তার সাথে বাড়াবাড়ি করত, তখন সে তাকে মাফ করে দিত। আর যখন কারো কাছে তার টাকা-পয়সা পাওনা হত আর ঐ ব্যক্তি বলত যে, আমার এ মুহূর্তে টাকা পরিশোধ করার মত সামর্থ্য নেই, তখন সে স্বীয় কর্মচারীদেরকে বলত যে, "এ

লোকটির এ মুহূর্তে আমার টাকা আদায় করার সামর্থ্য নেই। এজন্য তাকে ছেড়ে দাও।”

এভাবে সে নিজের হক ছেড়ে দিত। মহান আল্লাহ এটা শুনে বলবেন যে, যেহেতু এই মানুষটি আমার বান্দাদের সাথে সদাচরণ করত, মাফ করে দিত এবং নিজের হক ছেড়ে দিত, তাই আজ আমিও তার সাথে ক্ষমার আচরণ করব এবং তাকে ক্ষমা করে দিব।

ফলশ্রুতিতে এটার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন।

শাহ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. এর ছেলের মুজাহাদা

এ কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট যখন কেউ নিজ ইসলাহ বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে যেত, তখন তাওবার পর তাকে এ সবক দেয়া হত যে, স্বীয় গোস্বাকে বিলকুল (সম্পূর্ণ) খতম করে দিবে। আর এই গোস্বাকে খতম করানোর জন্য বড় বড় মুজাহাদা করানো হত।

হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। আর সারা দুনিয়া থেকে মানুষ তাঁর নিকট নিজ ইসলাহের উদ্দেশ্যে আসত। তাঁর ছেলে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোন মূল্যায়ন করেনি। এমনটি প্রায় হয়ে থাকে যে, যতদিন পর্যন্ত নিজের মুরব্বী হায়াতে থাকেন, তো দিলের মধ্যে তাঁর কোন কদর থাকে না। তাইতো প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে “ঘরের মুরগী ডাল বরাবর”।

পিতা ঘরে বিদ্যমান, সারা দুনিয়া এসে তাঁর থেকে ফয়েয হাসিল করছে। কিন্তু ছেলের এ সবের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সে নিজ খেলাধুলায় মত্ত। যখন পিতার ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন চোখ খুলল। আর এটা চিন্তা করল যে, ঘরের মধ্যে কত বড় দৌলত বিদ্যমান ছিল। সারা দুনিয়া এসে তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে কিন্তু আমি তো সময় নষ্ট করেছি আর তাঁর থেকে কিছুই অর্জন করতে পারিনি। এখন খোঁজ-খবর নিলেন যে, আমার মরহুম পিতার কাছে যাঁরা আসতেন এবং যাঁরা আমার পিতার মাধ্যমে নিজেদের ইসলাহ করিয়েছেন,

ইনাদের মধ্যে কে আছেন এমন যিনি আমার আব্বাজান থেকে সবচেয়ে বেশি ফয়েয হাসিল করেছেন। যাতে করে কমপক্ষে আমি তাঁর নিকট গিয়ে ফয়েয হাসিল করতে পারি।

অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, এমন একজন বুযুর্গ বলখে থাকেন। আর ইনি নিজে ইউপি তথা উত্তর প্রদেশের গাঙ্গুহে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তিনি বলখ যাওয়ার নিয়্যত করে ফেলেন এবং শাইখকে জানিয়ে দেন যে, আমি বলখ আসছি।

এই বুযুর্গ যখন সংবাদ পেলেন যে, আমার শাইখের ছেলে আগমন করছেন তখন তিনি খাদেম নফর সহ শহরের বাইরে গিয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং খুব ইজ্জত-সম্মান করে বাসায় নিয়ে আসেন। তাঁর জন্য শানদার খানা রান্না করেন, খুব দাওয়াত করেন। এভাবে এক দুই দিন যাওয়ার পর ছাহেবযাদা আরয করলেন যে, হযরত! আপনি আমার সাথে অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং আমার মূল্যায়ন করেছেন কিন্তু আমি মূলত অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। শাইখ জিজ্ঞেস করলেন সেই উদ্দেশ্য কী? ছাহেবযাদা আরয করলেন, হযরত! আমি তো এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আমার মরহুম আব্বাজান থেকে যে বাতেনী দৌলত আপনি নিয়ে এসেছেন সেটার কিছু অংশ আপনার থেকে হাসিল করব। কেননা তাঁর জীবদ্দশায় আমি তাঁর থেকে নিতে পারিনি।

শাইখ বললেন, আচ্ছা তুমি এ উদ্দেশ্যে এসেন। তো এখন থেকে এই খাতির আপ্যায়ন, মেহমানদারী সব বন্ধ থাকবে। এই ইজ্জত ও সম্মান এই দাওয়াতের শানদার খানা সব বন্ধ। এখন তুমি যেটা করবে সেটা হল মসজিদের পাশে একটি হাম্মাম আছে। ঐ হাম্মামের পাশে হবে তোমার ঠিকানা। সেখানেই তোমাকে ঘুমাতে হবে। আর হাম্মামের আগুন জ্বালিয়ে সব সময় সেটার পানি গরম রাখতে হবে, আর সেটার জন্য কাঠ-লাকড়ী সংগ্রহ করে এনে এতে ফুঁক দিবেন।

যেহেতু শীত মৌসুম ছিল। নামাযী মানুষদের উযূর জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করা হত। ঐ ছাহেবযাদাকে বলে দিলেন: ব্যস তোমার কাজ স্রেফ এটাই। কোন ওয়াযীফা কোন তাসবীহ ইত্যাদি বলেননি।

কোথায় সেই ইজ্জত-সম্মান! আর কোথায় এই মুজাহাদা ও খেদমত!

অহংকারের চিকিৎসা

যেহেতু ইনি ইখলাসের সাথে নিজের ইসলাহের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, এজন্য শাইখের নির্দেশ পালনার্থে ঐ স্থানে গেলেন এবং ঐ কাজে গেলেন।

এখন একটা লম্বা সময় পর্যন্ত তাঁর দায়িত্বে ব্যস স্রেফ একাজই ছিল যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ও মসজিদ এর হাম্মাম আলোকিত করো।

ঐ বুযুর্গ জানতেন যে, এ ছাহেবযাদাদের মধ্যে বংশীয় আভিজাত্য থাকলেও অন্তর থাকে পবিত্র। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটা দোষ অবশ্যই থাকে। আর সেটা হল অহংকার ও দাম্ভিকতা। এটার চিকিৎসা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই এমন কাজ তাঁর উপর সোর্পদ করেছেন যাতে তাঁর এই ব্যাধির চিকিৎসা হয়ে যায়।

কিছুদিন পর শাইখ এটা দেখার জন্য যে, শাহযাদেগীর খেয়াল ও কল্পনা এখনো তাঁর অন্তরে আছে নাকি খতম হয়ে গেছে? তাঁর পরীক্ষার জন্য শাইখ নিজের বাসার মেথর যে বাসার ময়লা আবর্জনা উঠিয়ে নিয়ে যেত তাকে বললেন: আজ যখন ময়লা নিয়ে যাবে, তখন হাম্মামের পাশে হাম্মামের আগুন আলোকিত করার জন্য যে লোকটি নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তার পাশ দিয়ে যাবে। আর সে তোমাকে যা কিছু বলবে সেটা এসে আমাকে জানাবে।

ফলশ্রুতিতে যখন ঐ মেথর ময়লা আবর্জনা নিয়ে সেই ছাহেবযাদার পাশ দিয়ে গেল, তখন তার প্রচন্ড গোস্বা আসল এবং

বলল যে, আজ যদি আমার এলাকা গাঙ্গুহ হত তাহলে তুমি এই ময়লা-আবর্জনা নিয়ে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সাহসই পেতে না।

মেথর শাইখকে জানিয়ে দিল যে, এই মন্তব্য করেছে। শাইখ চিন্তা করলেন ও বুঝলেন যে, সুলূকের পথে সে এখনো কাঁচাই আছে। এখনো কিছু অহংকার আছে। ফলে ঐ হাম্মামের পানি গরমের আদেশ বলবৎ রাখা হল।

দ্বিতীয় পরীক্ষা

কিছুদিন যাওয়ার পর শাইখ পুনরায় ঐ মেথরকে বলেছেন যে, এখন ময়লা উঠিয়ে নিয়ে যাও। আর এবার একদম তার পাশ ঘেঁষে যাবে। ফলে ঐ মেথর আরো বেশি কাছ দিয়ে গেল। ফলে ছাহেবযাদা ঐ মেথর এর দিকে গোস্বার দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু এবার মুখে কিছু বললেন না। ঐ মেথর গিয়ে শাইখকে জানিয়ে দিল যে, আজ এই ঘটনা হয়েছে। শাইখ অনুধাবন করতে পারলেন যে, ঔষধ কার্যকর হচ্ছে।

তৃতীয় পরীক্ষা

কিছুদিন পর শাইখ তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন: এবার তার এতটুকু পাশ দিয়ে যাবে যেন ময়লা-আবর্জনা তার গায়েও লেগে যায়। আর সেখান থেকে কিছু ময়লা যেন তার গায়েও পড়ে। ফলে মেথরটি যখন তার পাশ দিয়ে গেল, আর কিছু ময়লা তার গায়েও ফেলে দিল, তখন ঐ ছাহেবযাদা নজর উঠিয়েও দেখেননি। মেথর শাইখকে হালত জানাল। শাইখ বললেন: হ্যাঁ উপকার হচ্ছে।

চতুর্থ পরীক্ষা

কিছুদিন পর শাইখ পুনরায় মেথরকে নির্দেশ দিলেন যে, এবার ময়লার টুকরী নিয়ে তার পাশ দিয়ে যাবে। আর কোন কিছুর সাথে টক্কর খেয়ে তার পাশে এমনভাবে পড়বে যেন পুরো ময়লা-আবর্জনা তার উপর পড়ে। এরপর সে কী করে তা আমাকে জানাবে। ফলে ঐ

মেথর গেল আর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। যখন ছাহেবযাদা দেখল যে, মেথর পড়ে গেছে, তখন তার নিজের চিন্তার পরিবর্তে মেথরের চিন্তা হল। আর তাকে জিজ্ঞেস করল যে, ভাই! তুমি কোন চোট্ পাওনি তো? নিজের কোন চিন্তা নাই যে, আমার কাপড় নোংরা হয়ে গেছে। মেথর শাইখকে ঘটনার বিবরণ শুনাল। শাইখ বললেনঃ এবার সফলতার আশা করা যায়।

বড় পরীক্ষা এবং দৌলতে বাতেনী লাভ

এরপর আরেকটি ঘটনা ঘটল। সেটা হল শাইখ বলখী রহ. শিকারের উদ্দেশ্যে বাইরে যেতেন। সঙ্গে শিকারী কুকুরও থাকত। সম্ভবত এর মধ্যে তিনি কোন দ্বীনী হেকমত দেখেছেন। আর শিকারী কুকুরের মাধ্যমে শিকার করা কোন নাজায়িয কাজও না বরং জায়িয আছে।

যাই হোক ঐ শাইখ একবার শিকারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এই ছাহেবযাদাকেও সাথে নিয়ে নিলেন আর শিকারী কুকুরের লৌহশিকল ছাহেবযাদার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ঐ শিকারী কুকুরগুলো ছিল খুব শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান। অথচ এই বেচারা ছিল ক্ষুধার্ত ও দুর্বল। ফলশ্রুতিতে যখন শিকারী কুকুরগুলো শিকারের পিছনে দৌড় লাগাল আর এই বেচারা দুর্বল হওয়ার কারণে ঐ কুকুরগুলোর সাথে পেরে উঠতে পারল না। তখন সে পড়ে গেল। যেহেতু শাইখের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই শিকল হাতছাড়া করা যাবে না। এজন্য তিনি শিকল ছাড়েননি। হেঁচড়ে চলার কারণে রক্তাক্ত হয়ে যান। কিন্তু শাইখের নির্দেশ পালনার্থে শিকল হাত থেকে ছেড়ে দেননি।

এ ঘটনার পর রাত্রে শাইখ নিজ পীর ও মুরশিদ হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলছেন: "আমি তো তোমার থেকে এত মেহনত নিইনি।" কেননা পিতার অন্তরে সব সময় সন্তানের খেয়াল থাকে।

ফলে পরের দিন শাইখ সকালে তাঁকে ডেকে বুকের সাথে লাগালেন এবং বললেন যে, যে দৌলত ও নেয়ামত আমি তোমার আব্বা থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তুমি সে দৌলত চেয়েছিলে, যা তোমার আমানত ছিল। সেই দৌলতই আমি তোমার কাছে সমর্পণ করে দিলাম। আর যেহেতু এই কর্মপদ্ধতি ব্যতীত ঐ দৌলত পাওয়া অসম্ভব ছিল। এজন্য আমি এরূপ অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছি।

গোস্বা নিয়ন্ত্রণে রাখুন, ফেরেশতাদের থেকে আগে বেড়ে যান

যাই হোক, আমি একথা আরয করছিলাম যে, যখন এই ছাহেবযাদা নিজের ইসলাহের জন্য সেখানে (বলখ) গেলেন, তখন শাইখ তাঁকে ওয়াযীফাও বাতলে দেননি, তাসবীহাতও পড়তে দেননি। না অন্য কোন মামূলাত কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা মস্তিষ্ক হতে অহংকার বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথে সুন্দর আচরণ করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এই গোস্বা যেটা অহংকারের মূল কারণ ও ফলাফল হয়ে থাকে সেটা খতম হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন; সুলূক ও তাসাওউফের বিশাল অধ্যায় এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হল মানুষের তবিয়ত হতে গোস্বা বের হয়ে যাবে এবং গোস্বার উপর নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে। আর যখন এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা মানুকে এমন মাকামে পৌঁছে দেন যে, ফেরেশতারাও তাঁকে ঈর্ষা করে। ফেরেশতাদের মধ্যে তো গোস্বা থাকেই না। উপরন্তু তারা সব সময় ইবাদতে থাকেন এবং তাঁদের দ্বারা কারো কষ্ট হয় না, তো এটা কোন কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি ফেরেশতাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু মানুষ ও আদমের সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই আমি গোস্বা রেখেছি। মানুষ হয়ত আমার ভয়ে অথবা আমার ভালোবাসায় নিজ গোস্বাকে দাবিয়ে রাখে। যদ্দরুন সে ফেরেশতাদের থেকেও আগে বেড়ে যায়। কিভাবে বেড়ে যায়? শুনুন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর ফিকহের উপর আমরা সবাই আমল করি। সারা দুনিয়ায় মহান আল্লাহ তাঁর ফয়েয চালু করে দিয়েছেন। তাঁর সাথে হিংসাকারী মানুষ ছিল অনেক। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেছিলেন, প্রসিদ্ধি দান করেছিলেন, ইলম দান করেছিলেন। অবশ্য তাঁর ভক্তবৃন্দও ছিলেন অনেক। এজন্য হিংসুকও অনেক ছিল। হিংসার কারণে মানুষ তাঁর বদনাম করত। সমালোচনা করত।

একদিন তিনি বাসায় যাওয়ার জন্য বের হলেন, তো একজন মানুষ তাঁর সাথে লেগে গেল আর পুরো পথ গালি দিতে থাকল। আপনি এমন! আপনি তেমন ইত্যাদি। যখন গলির মোড় আসল, তখন ইমাম ছাহেব থামলেন আর ঐ ব্যক্তিকে বললেন: ভাই! যেহেতু এই মোড় থেকে আমার পথ পৃথক হয়ে যাবে, কেননা আমার বাসার মোড় এসে গেছে। আপনার পথও আলাদা হয়ে যাবে। আপনার অন্তরে যেন কোন অনুশোচনা না থাকে এজন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। আপনার যত গালি দিতে মনে চায়, এখানে দাঁড়িয়ে দিয়ে দিন। এরপর আমি আমার বাসায় চলে যাব।

ঘটনাটি কিতাবে লিখিত পাওয়া যায়।

চল্লিশ বছর যাবত ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায

আমি আমার শাইখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব জালালাবাদী রহ. থেকে শুনেছি যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়তেন।

এটারও অদ্ভুদ একটা কাহিনী আছে। শুরু দিকে তাঁর এমন অভ্যাস ছিল না। বরং শুরুর দিকে তাঁর মামূল বা অভ্যাস ছিল শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে

যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় এক বৃদ্ধা মহিলাকে বলতে শুনলেন "ইনি ঐ ব্যক্তি যিনি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েন।"

ব্যস একথা শোনামাত্রই ইমাম ছাহেবের আত্মমর্যাদা জেগে উঠল যে, এই বৃদ্ধা মহিলা তো আমার ব্যাপারে এ ধারণা রাখে যে, আমি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়ি। অথচ আমি পড়িনা। যার মানে হল আমার এমন বিষয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে, যা আমার মধ্যে বিদ্যমান নেই।

ঐদিন থেকেই তিনি পাক্কা নিয়্যত করলেন যে, বাকী সারাজীবন ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়বেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মামূল এমনটি বানালেন যে, সারারাত ইবাদত করতেন এবং ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়তেন। আবার ব্যাপার এমন ছিল না যে, যখন সারারাত ইবাদত করেছে, তো এখন সারাদিন শুধু ঘুমাবেন। কেননা ইমাম ছাহেবের ব্যবসাও ছিল। দরস-তাদরীসের পবিত্র অভ্যাসও ছিল। লোকজন তাঁর নিকট এসে ইলম অর্জন করতেন।

এজন্য তিনি সারারাত ইবাদত করতেন এবং ফজর নামাযের পর দরস ও তাদরীস এর খেদমত আঞ্জাম দিতেন। যোহরের নামায পর্যন্ত একাজে ব্যস্ত থাকতেন। যোহরের নামাযের পর হতে আসর পর্যন্ত ঘুমানোর মা'মূল ছিল।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. যোহরের নামাযের পর নিজ বাসায় তাশরীফ নিয়ে গেছেন। উপর তলায় তাঁর ঘর ছিল। ঘরে গিয়ে আরাম করার জন্য বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে কেউ একজন নিচের গেইটে কড়া নাড়লেন।

আপনি অনুমান করুন যে মানুষটি সারা রাত জেগে ছিলেন এবং সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। ঐ সময় তাঁর মনের অবস্থা কেমন হবে? এ সময় কোন মানুষ আসলে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইমাম ছাহেব

উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন। দরওয়াযা খুললেন তো দেখলেন যে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। ইমাম সাহেব রহ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কেন এসেছেন? তিনি বললেন: একটা মাসআলা জানতে এসেছি।

দেখুন, যখন ইমাম ছাহেব মাসআলা বলার জন্য বসেছেন, সেখানে এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করার খবর নেই। এখন অসময়ে পেরেশান করার জন্য এখানে এসে গেছে। কিন্তু ইমাম ছাহেব তাকে কিছু বলেননি বরং বলেছেন: আচ্ছা ভাই! কী মাসআলা জানতে চান? সে বলল: হযরত কী বলব আসার পূর্বেও মনে ছিল, এখন ভুলে গেছি। ইমাম ছাহেব বললেন: ঠিক আছে মনে পড়লে আবার জিজ্ঞেস করে নিবেন।

এভাবে পরপর তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ইমাম ছাহেব উপরে গিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতেই সে নিচ থেকে আওয়ায দেয়। আর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে যে, মাসআলা জানতে এসেছিলাম কিন্তু এখন ভুলে গেছি! আর ইমাম ছাহেবও বলেন: ঠিক আছে। সামনে মনে পড়লে জিজ্ঞেস করে নিবেন।

সর্বশেষে ইমাম ছাহেবের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে বললেন যে, হযরত! আমি জানতে এসেছি যে, মানুষের নাপাকী বা পায়খানার স্বাদ কেমন হয়? তিতা নাকি মিঠা? (নাউযুবিল্লাহ, এটাও কোন মাসআলা)

এখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেত

যদি অন্য কোন মানুষ হত, আর সে এখন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে থাকত, তো এখন এ প্রশ্নের পর তার ধৈর্যের বাঁধ অবশ্যই ভেঙ্গে যেত। কিন্তু ইমাম ছাহেব অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন যে, যদি মানুষের নাপাকী তাজা হয় তাহলে এর মধ্যে কিছুটা মিষ্টিভাব থাকে। আর যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলল যে, আপনি কি চেখে দেখেছেন? (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. বললেন: সব জিনিসের ইলম চাখার দ্বারা হাসিল করা যায় না বরং কোন কোন জিনিসের ইলম আকল দ্বারা হাসিল করা হয়। আর আকল দ্বারাই এটা জানা যায় যে, তাজা নাপাকীর উপরে মাছি বসে, শুকনো নাপাকীর উপর বসে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, উভয়টির মধ্যে পার্থক্য আছে। নতুবা মাছি উভয়টার উপরই বসত।

নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ ধৈর্যশীল

যখন ইমাম ছাহেব এ উত্তর দিয়ে দিলেন তখন ঐ ব্যক্তি বলল: ইমাম ছাহেব হুযূর! আমি আপনার নিকট করজোড় করে অনুরোধ করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আজ আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন।

ইমাম ছাহেব বললেন: আমি কিভাবে হারিয়ে দিলাম? লোকটা বলল: আমার এক বন্ধুর সাথে আমার তর্ক চলছিল যে, এ যুগে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল কে? আমার বক্তব্য ছিল এই যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। কিন্তু আমার বন্ধুর বক্তব্য হল ইমামে আযম অর্থাৎ আপনি সব থেকে বেশি ধৈর্যশীল।

এই প্রেক্ষিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য চিন্তা করলাম যে, এমন এক সময় আপনার কাছে আসব যখন আপনার আরামের সময়। এভাবে দুই তিন বার আপনাকে উপর নিচে দৌড়াদৌড়ি করাব। এরপর আপনার কাছে বেহুদা কোন একটা প্রশ্ন করব আর দেখব যে, আপনার রাগ আসে কিনা? যদি রাগ আসে তো আমি জিতে গেলাম। আর রাগ না আসলে আপনি জিতে গেলেন। কিন্তু আজ আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। আর বাস্তব সত্য কথা এই যে, আমি এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আপনার মত ধৈর্যশীল কোন মানুষ দেখিনি।

এর দ্বারা অনুমান করুন, হযরত ইমামে আযম রহ. কোন্ মাকামের মানুষ ছিলেন? তাঁর উপর যদি ফেরেশতাদের ঈর্ষা না আসে, তাহলে কার উপর আসবে? তিনি স্বীয় নফসকে বিলকুল মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

“হিলম” বা ধৈর্য সৌন্দর্য দান করে

তাইতো হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَللّٰهُمَّ أَغِنِّىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ

“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন ইলম দ্বারা এবং আমাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন “হিলম” বা ধৈর্য দ্বারা।”[১১]

কোন মানুষের কাছে যদি ইলম বা জ্ঞান থাকে কিন্তু হিলম বা সহিষ্ণুতার গুণ না থাকে, তাহলে ইলম সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য আসবে না। এ পথে চলার জন্য এবং স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল গোস্বা করবে না। এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ لَا تَغْضَبْ তুমি গোস্বা করনা। এটাই প্রথম সবক এবং এটাই সংক্ষিপ্ত উপদেশ। আর এটাই মহান আল্লাহর গোস্বা হতে বাঁচার উপায়।

গোস্বা হতে বাঁচার কৌশলসমূহ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি যে, “গোস্বা করনা”। বরং গোস্বা হতে বাঁচার কৌশল কুরআনও বলেছে এবং জনাব রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এই কৌশলের দ্বারা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুশীলন করা হয়।

প্রথম কথা হল মানুষের ইখতিয়ারের বাইরে যে গোস্বা এসে যায় এবং মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ঐ গাইরে ইখতিয়ারী উত্তেজনার উপর মহান আল্লাহর কাছে কোন ধরপাকড় হবে না। কেননা সেটা মানুষের ইখতিয়ারের বাইরে।

---

১১. কানযুল উম্মাল হাদীস নং ৩৬৬৩

অবশ্য মনের মধ্যে যে জোশ পয়দা হয় সেটাকে নিজ সীমারেখার মধ্যে রাখুন। সেটার প্রভাব নিজ কোন কাজে পড়তে দিবেন না। উদাহরণস্বরূপ কারো উপর গোস্বা আসল, তো এ গোস্বা আসাটা কোন গুনাহ নয় কিন্তু যদি এ গোস্বার ফলে কাউকে প্রহার করে অথবা কাউকে বকাঝকা করে বা গীবত করে, তাহলে তো ঐ গোস্বার তাকাযার উপর আমল হয়ে গেল। এখন এর উপর পাকড়াও হবে এবং এটা গুনাহ।

গোস্বার সময় أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ুন

এজন্য কখনো মনের মধ্যে এ জাতীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ঐ কাজ করবেন যেটার নির্দেশ মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে−

وَاِمَّا يَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ

অর্থাৎ "আর যদি শয়তান তোমার অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, তাহলে মহান আল্লাহর নিকট (বিতাড়িত শয়তান হতে) আশ্রয় কামনা কর।"[১২]

এজন্য গোস্বা আসা মাত্রই أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ে নিন। এটা কোন কঠিন কাজ নয়। সামান্য ধ্যান আর অনুশীলনের প্রয়োজন।

গোস্বার সময় বসে যাও বা শুয়ে পড়

গোস্বা আসলে দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হবে সেটার ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ করেছেন এবং এটা বড় অদ্ভুত পরীক্ষিত একটি আমলও বটে। সেটা হল গোস্বার তীব্রতা থাকলে যদি আপনি দাঁড়ানো থাকেন তাহলে বসে পড়বেন। এরপরও গোস্বা না কমলে শুয়ে পড়বেন। কেননা গোস্বার বৈশিষ্ট্য হল এটা উপরে মস্তিষ্কের দিকে চড়ে। আর যখন গোস্বার প্রাবল্য থাকে, তখন মানুষ উপরের দিকে উঠে। কেননা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন

১২. সূরা আরাফ, আয়াত নং ২০০

গোস্বার সময় যদি মানুষ শোয়া অবস্থায় থাকে, তাহলে উঠে বসে পড়ে। বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যায়। এজন্য এটাকে খতম করার কৌশল বলতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সেটার উল্টো কাজ করো। অতএব গোস্বার সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাও, বসে থাকলে শুয়ে পড় এবং নিজের অবস্থাকে নিচের দিকে নিয়ে আসো।"

এই কৌশল প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন এ লোকগুলো গোস্বার ফলে না জানি কোন্ মুসীবতের সম্মুখীন হবে? এজন্য তিনি এই কৌশল বাতলে দিয়েছেন।[১৩]

অন্য একটি বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, মানুষ ঐ সময় পানি পান করবে।

গোস্বার সময় মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করবে

গোস্বা নিয়ন্ত্রণে আনার আরেকটা কৌশল হল মানুষ চিন্তা করবে যে, যে ধরণের গোস্বা আমি ঐ মানুষটির উপর করতে চাই, যদি আল্লাহ তাআলা আমার উপর ঐ ধরণের গোস্বা করেন, তাহলে আমার অবস্থা কেমন হবে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. স্বীয় ক্রীতদাসের উপর গোস্বা করছেন এবং বকাঝকা করছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন اَللّٰهُ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَيْهِ মনে রেখ, তোমার যে পরিমাণ ক্ষমতা এই দাসটির উপর আছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা মহান আল্লাহর তোমার উপর আছে। তুমি যেই ক্ষমতাবলে একে কষ্ট দিচ্ছ এর থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা মহান আল্লাহর তোমার উপর আছে।

---

১৩. সুনানে আবূ দাউদ, আদব অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার ধৈর্য

আল্লাহ তাআলার ধৈর্য দেখুন। কিভাবে প্রকাশ্যে তাঁর অবাধ্যতা হচ্ছে, কুফর হচ্ছে, শিরক হচ্ছে, এমনকি মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহান আল্লাহ এদের সবাইকে রিযিক দিচ্ছেন। বরং আল্লাহ পাক তাঁর কোন কোন বিদ্রোহী বান্দার উপর তো দুনিয়াবী দৌলতের স্তূপ লাগিয়ে দেন!! কী অপরিসীম ধৈর্য মহান আল্লাহর!

এজন্য এটা ভাবতে হবে যে, যখন মহান আল্লাহ নিজ গোস্বাকে নিজ বান্দাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন না, আমার উপরও তাঁর গোস্বার প্রয়োগ করছেন না, তাহলে আমি আমার অধীনস্তদের উপর কেন গোস্বা ব্যবহার করব?

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর ক্রীতদাসকে বকা দেয়া

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. কে দেখলেন যে, তিনি নিজ ক্রীতদাসকে বকাঝকা করছেন, তখন তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন:

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

অর্থাৎ “একদিকে তুমি স্বীয় ক্রীতদাসকে বকাঝকাও করবে আবার “সিদ্দীক”ও হয়ে যাবে, কাবার রবের কসম, এমনটি হতে পারে না।”[১৪]

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গোস্বা করতে বারণ করেছেন।

এজন্য অন্যের উপর গোস্বা আসলে এটা চিন্তা করতে হবে যে, আমার এ ব্যক্তির উপর যে পরিমাণ ক্ষমতা আছে এর থেকে অনেক বেশি শক্তি মহান আল্লাহর আমার উপর আছে। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করেন তাহলে আমার কোথায় ঠিকানা হবে?

---

১৪. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৭৯১

যাই হোক, গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এই কয়েকটি কৌশল বলা হল, যা কুরআনে কারীম এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ আমাদেরকে বাতলিয়েছে।

শুরুতেই গোস্বাকে একদম দমিয়ে রাখতে হবে

প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মানুষ স্বীয় আখলাকের ইসলাহ বা সংশোধন আরম্ভ করে, তো ঐ সময় হক নাহকের ফিকিরও করবে না। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন আছে যেখানে গোস্বা করা জায়িয ও বৈধ। কিন্তু একজন প্রাথমিক পর্যায়ের সালিকের জন্য যিনি আপন নফসের ইসলাহ আরম্ভ করছেন, তার জন্য করণীয় হল হক নাহকের পার্থক্য ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গোস্বাকে দমিয়ে রাখা, যাতে করে ধীরে ধীরে এই বদ অভ্যাস স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে।

যদি একবার এটাকে দাবিয়ে দেয়া যায় এবং তার বিষ বের করে দেয়া যায়, তো পরবর্তীতে যখন ঐ গোস্বাকে ব্যবহার করা হবে তখন ইনশাআল্লাহ সঠিক স্থানে ব্যবহার হবে। কিন্তু শুরুতে কোন স্থানেই গোস্বা করবে না। চাই আপনার এটা জানা থাক যে, আমার এখানে গোস্বার হক আছে। তারপরও গোস্বা করবে না। আর যখন এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে তখন গোস্বা করা হলে সেই গোস্বা সীমার ভিতরে থাকবে। সীমার বাইরে যাবে না, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকবে।

গোস্বায় ভারসাম্য

অনেক সময় গোস্বার প্রয়োজন হয়। বিশেষত যাদের তারবিয়্যাত বা দীক্ষার দায়িত্ব থাকে। উদাহরণস্বরূপ পিতার নিজ সন্তানদের সাথে গোস্বা করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষককে ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য এবং শাইখকে তাঁর মুরীদদের ইসলাহের জন্য গোস্বা করতে হয়।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যতটুকু গোস্বা করার দরকার অতটুকুই করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গোস্বা করা অন্যায়। কেননা প্রয়োজন এর

অতিরিক্ত গোস্বার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত জেদ মেটানোও শামিল হয়ে যাবে, যদ্দরুন সে গুনাহগারও হবে। আর তাতে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নানা মেযাজী রং

অধিকাংশ আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে আপনারা শুনেছেন যে, তাঁরা নিজেদের সমস্ত মুরীদ ও মুতাআল্লিকীনের সাথে স্নেহ ও মহব্বতপূর্ণ আচরণ করেন। রাগারাগি বা গোস্বা করেন না। কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের রং বিভিন্ন ধরনের হয়। কারো উপর দয়ার প্রাধান্য, তো তিনি দয়া ও মায়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদের রূহানী চিকিৎসা করতে থাকেন। আবার কারো উপর জালালী তবিয়তের প্রাবল্য হয় তিনি ঐ জালালের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। কিন্তু ঐ জালাল বা কড়া মেযাজ তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটা সীমার বাইরে যায় না।

এই যে একটা কথা প্রসিদ্ধ যে, অমুক বুযুর্গ খুব জালালী প্রকৃতির ছিলেন। তো 'জালালী' হওয়ার মর্ম এটা নয় যে, তিনি যেখানে সেখানে শুধু গোস্বাই করতে থাকেন। আর স্বাভাবিক সীমার বাইরে গোস্বা করেন। বরং যে সময় যার সাথে যতটুকু গোস্বা করা দরকার তার সাথে ঐ সময় ততটুকুই গোস্বা করেন। আর 'তরবিয়্যতে বাতেনী' তথা আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য তাঁরা এটার প্রয়োজন অনুভব করতেন। সেই অনুপাতেই তাঁরা গোস্বা করতেন।

তাইতো আমাদের বুযুর্গ হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর ব্যাপারে এই যে একটা কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি বড় জালালী বুযুর্গ ছিলেন। ফারূকী ছিলেন অর্থাৎ হযরত উমর ফারূক রাযি. এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। এজন্য তবিয়তে গাইরত বা আত্মমর্যাদাও বেশি ছিল। কিন্তু তাঁর তরবিয়্যাতের অধীনে যে সব সালিক বা আল্লাহর পথের পথিক ছিলেন তাঁদের ব্যাপারে কখনোই তাঁর গোস্বা সীমার বাইরে যায়নি। আর সাধারণ অবস্থায় তাঁর মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বিরাজমান থাকত।

গোস্বার সময় ধমক দেয়া নিষেধ

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেন, আমি অন্যদেরকেও এ কথা বলি আর আমার নিজের আমলও এটাই যে, যারা আমার তরবিয়্যাতের অধীনে আছে, তার সাথে আমি গোস্বা করি বটে, কিন্তু যে আমার তরবিয়্যাতের অধীনে নয় তার উপর আমি কখনো গোস্বা করি না। হযরত থানভী রহ. আরো বলতেন: "যখন মনের মধ্যে গোস্বা থাকে, তখন কাউকে ধমক দিবে না বরং তখন খামুশ হয়ে যাও। পরবর্তী সময়ে যখন গোস্বা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন কৃত্রিম গোস্বা পয়দা করে পুনরায় বকা দাও। কেননা কৃত্রিম গোস্বা কখনো সীমার বাইরে যাবে না। পক্ষান্তরে প্রচন্ড উত্তেজিত অবস্থায় গোস্বা করলে সেটা সীমার বাইরে চলে যাবে।"

হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বলতেন: "আলহামদুলিল্লাহ, যখন আমি কাউকে আদব দেয়ার জন্য শাস্তি দিই, তখন ঠিক ঐ শাস্তি প্রদানের মুহূর্তেও মনের মধ্যে এ কথাটা থাকে যে, তার মর্যাদা আমার থেকে বেশি। এবং সে আমার থেকে উত্তম। আমি তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য আদিষ্ট। এজন্য এ কাজ করছি।"

অতঃপর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন: যেমন কোন বাদশাহ নিজ শাহজাদার কোন অন্যায় কাজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে জল্লাদকে নির্দেশ দিল যে, "এই শাহজাদাকে বেত্রাঘাত কর", তো এখন ঐ জল্লাদ বাদশাহর নির্দেশে শাহজাদাকে বেত্রাঘাত করবে সত্য, কিন্তু আঘাত করার সময়ও জল্লাদ এটাই চিন্তা করবে যে, সে হল শাহজাদা আর আমি হলাম জল্লাদ। তার মর্যাদা বেশি। কিন্তু বাদশাহর নির্দেশের কারণে বাধ্য হয়ে বেত্রাঘাত করছি।"

অতঃপর হযরত হাকীমুল উম্মাত বলেন: আলহামদুলিল্লাহ। পুরোপুরি গোস্বার মুহূর্তেও আমার অন্তরে এ খেয়াল জাগ্রত থাকে, এর মর্যাদা আমার থেকে বেশি। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হয়ে এ দায়িত্ব পালন করছি। এজন্য তাকে বকা দিচ্ছি বা শাস্তি দিচ্ছি।

তো হযরত থানভী রহ. বলতেন: একদিকে আমি তাকে বকাঝকা করছি, পাকড়াও করছি আর অপরদিকে আমি দিলে দিলে এই দু'আ করছি, ইয়া আল্লাহ! যেভাবে আমি তাকে পাকড়াও করছি, সেভাবে আখেরাতে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর যেভাবে আমি তাকে বকাঝকা করছি, ইয়া আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমার সাথে সেরকম মুআমালা করবেন না। কেননা যা কিছু আমি করছি, আপনার নির্দেশ মনে করেই করছি।

যাই হোক, ইসলাহ ও তারবিয়্যাতের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে এই ছিল হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর গোস্বা। অথচ লোকেরা তাঁর ব্যাপারে এমনিতেই প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে যে, তিনি বড় জালালী মেযাজের বুযুর্গ ছিলেন।

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর একজন পুরানো খাদেম ছিলেন। নাম হল ভাই নিয়ায ছাহেব রহ.। থানাভবন খানকায় হযরত থানভী রহ. এর নিকট থাকতেন। যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত হযরতের খেদমত করে আসছিলেন এজন্য কিছুটা মুখরা হয়ে গিয়েছিলেন।

একবার কেউ একজন হযরতের নিকট এসে তার ব্যাপারে অভিযোগ করেন যে, ভাই নিয়ায খুব মুখরা হয়ে গেছেন অনেক সময় খানকাহে আগন্তুকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

হযরতওয়ালা এটা শুনে বিষণ্ন হলেন যে, আরে এটা তো খুবই খারাপ কথা। আগন্তুক মেহমানদের সাথে এমন আচরণ। ফলশ্রুতিতে হযরত তাকে ডেকে বললেন, ভাই নিয়ায! তুমি নাকি আগন্তুকদের সাথে লড়াই ঝগড়া কর আর অভদ্রভাবে কথাবার্তা বল?

এটা শুনে ভাই নিয়াযের মুখ থেকে এ বাক্য বের হয়ে যায় "হযরত! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।"

বাহ্যিকভাবে ভাই নিয়ায সাহেব এটা বলতে চাচ্ছিলেন যে, যারা আমার ব্যাপারে আপনার নিকট অভিযোগ পেশ করেছে যে, আমি মানুষদেরকে বকাঝকা দেই, তারা যেন মিথ্যা না বলে, আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে "মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন।"

দেখুন একজন সামান্য খাদেম তার মনিবকে বলছে, মিথ্যা বলবেন না আল্লাহকে ভয় করুন। এ পরিস্থিতিতে তো ঐ খাদেম আরো বেশি তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উপযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একথাটা শোনামাত্রই দৃষ্টি নত করে ফেললেন এবং আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আসল কথা হল, ভাই নিয়াযের এ কথা শুনে হযরত হাকীমুল উম্মাতের চৈতন্যোদয় হল যে, আমি তো এক তরফা কথা শুনে তাকে ধমক দেয়া আরম্ভ করেছি। তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করিনি। তার ব্যাপারে কেউ একজন আমাকে জানানোর প্রেক্ষিতে তাকে বকাঝকা দেয়া শুরু করেছি। এ কাজটি আমি ঠিক করিনি।

এজন্য সঙ্গে সঙ্গে "ইসতিগফার" করতে করতে সেখান থেকে চলে গেছেন। এমন মহান ব্যক্তির ব্যাপারেই কিনা মন্তব্য করা হচ্ছে তিনি জালালী বুযুর্গ ছিলেন। মানুষদেরকে খুব বকাঝকা দিতেন।

বকাঝকার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: বাস্তবিক পক্ষে আমরা হযরত থানভী রহ. এর ওখানে স্নেহ ও ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। অবশ্য অনেক সময় মানুষের ইসলাহ বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে বকাঝকার প্রয়োজন হত, তো সেটাও খুব লক্ষ্য রেখে করতেন।

যাই হোক ছোট কাউকে বকার প্রয়োজন হলে মানুষের উচিত এসব বিষয় লক্ষ্য করে তরবিয়্যাত করা। উদাহরণস্বরূপ, সর্ব প্রথম এটা খেয়াল করবে যে, একে বকাঝকা করার দ্বারা আমার গোস্বা বের করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরং আসল উদ্দেশ্য হল তার ইসলাহ ও সংশোধন। যার পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন যে, পুরোপুরি গোস্বার মুহূর্তে কোন পদক্ষেপ নিবে না বরং যখন গোস্বা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন চিন্তা-ভাবনা করে যতটুকু গোস্বা করা দরকার, কৃত্রিম গোস্বা সৃষ্টি করে অতটুকুই গোস্বা কর। এর থেকে যেন কমও না হয়, বেশিও না হয়। কিন্তু যদি উত্তেজিত অবস্থায় গোস্বার উপর আমল করে ফেলে, তবে দেখা যাবে যে, গোস্বা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র

এখন দেখার বিষয় হল এই গোস্বার সঠিক ক্ষেত্র ও স্থান কি? গোস্বা করার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র এবং সঠিক স্থান হল আল্লাহ তাআলার নাফরমানী ও গুনাহসমূহ। এসব জিনিসকে মানুষ ঘৃণা করবে এবং এগুলো দূর করার জন্য যতটুকু গোস্বা দরকার অতটুকু গোস্বা মানুষ ব্যবহার করবে। এটা হল গোস্বার প্রথম ক্ষেত্র।

পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি আলামত

একটি হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ أَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَأَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে অথবা আল্লাহর জন্যই কাউকে কোন কিছু হতে বিরত রাখে আর আল্লাহর জন্য মহব্বত করে ও আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।"[১৫]

---

১৫. তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় নং ৬১

তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

প্রথম আলামত

এ হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪টি জিনিসকে পূর্ণ ঈমানের আলামত বলেছেন।

প্রথম আলামত হল যখন দিবে আল্লাহর জন্য দিবে। এর মর্ম হল যদি কোন নেকীর ক্ষেত্রে কোন খরচ করে তাহলে সেই খরচ করাটা যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়।

মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে, পরিবারের সদস্যদের জন্যও খরচ করে, সদকা খাইরাতও করে। এসব ক্ষেত্রে খরচের সময় যেন একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশী করার নিয়্যত থাকে অর্থাৎ আমি দান-খাইরাত শুধু এজন্য করব, যেন আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আমাকে সওয়াব দান করেন। দান-সাদাকার দ্বারা যেন অন্যের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন বা সুনাম সুখ্যাতি কামনা উদ্দেশ্য না হয়। তাহলেই এ সাদাকা প্রদান আল্লাহর জন্য হবে।

দ্বিতীয় আলামত

দ্বিতীয় আলামত হল, "مَنَعَ لِلّٰهِ" অর্থাৎ "যদি না দেয় সেটাও আল্লাহরই জন্য"। উদাহরণস্বরূপ কোন স্থানে পয়সা খরচ হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখল। সেটাও একমাত্র আল্লাহ পাকেরই জন্য। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন, অনর্থক ব্যয় করবে না। এজন্যই সে অনর্থক খরচ না করে পয়সা বাঁচায়। এই বিরত রাখাও আল্লাহর জন্য হয়ে গেল। এটাও ঈমানের আলামত।

তৃতীয় ও চতুর্থ আলামত

তৃতীয় আলামত হল وَأَحَبَّ لِلّٰهِ অর্থাৎ যদি কাউকে মহব্বত করে, তবে সেটাও আল্লাহর জন্যই করে। উদাহরণস্বরূপ কোন আল্লাহওয়ালা

বুযুর্গের সাথে যে মহব্বত হয় সেটা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয় বরং তাঁদের সাথে মহব্বত এজন্য হয় যে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখলে আমাদের দ্বীনী উপকার হবে এবং আল্লাহ তাআলা খুশী হবেন।

এই মহব্বত ও ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং এটা ঈমানের আলামত।

চতুর্থ আলামত হল وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য গোস্বা করে। যার প্রতি রাগ বা গোস্বা, সেটা তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয় বরং কোন মন্দ কর্মের কারণে অথবা তার এমন কোন কথা বা কাজের কারণে যা প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপলক্ষ। তো এই গোস্বা ও অসন্তুষ্টি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই হল। এটাও গোস্বার একটি বৈধ ক্ষেত্র।

ব্যক্তিকে ঘৃণা করব না

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন একটা কথা বলেছেন যা সব সময় মনে রাখার মত। সেটা হল ঘৃণা ও বিদ্বেষ কোন কাফেরের সাথে নয় বরং তার "কুফর" এর সাথে। ফাসেকের সাথে বিদ্বেষ নয় বরং তার "ফিসক" এর সাথে বিদ্বেষ। গুনাহগারের প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নয় বরং ঘৃণা বা বিদ্বেষ হল ঐ গুনাহের প্রতি যে গুনাহ বা পাপকাজে সে মানুষটি লিপ্ত। তার সত্তা গোস্বার ক্ষেত্র নয় বরং তার কাজ হল গোস্বার ক্ষেত্র। কেননা ব্যক্তিসত্তা তো রহমতের যোগ্য। সে বেচারা অসুস্থ। কুফরের ব্যাধিতে আক্রান্ত। ফিসকের রোগে লিপ্ত। মানুষ রোগকে ঘৃণা করে ব্যক্তিকে নয়। কেননা ব্যক্তিরা রোগীকে ঘৃণা করলে তার দেখাশুনা কে করবে?

সুতরাং আমাদের ঘৃণা হবে কুফর, ফিসক ও গুনাহের প্রতি। কাফের, ফাসেক, বা গুনাহগারের প্রতি নয়।

এ কারণেই তো ঐ মানুষটা যদি কুফর, ফিসক বা পাপাচার হতে ফিরে আসে, তবে আলিঙ্গনের উপযুক্ত হয়ে যায়। কেননা তার ব্যক্তিসত্তার সাথে তো কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দেখুন। যে মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা রাযি. এর কলিজা বের করে কাচা চিবিয়েছে অর্থাৎ হযরত হিন্দা রাযি. এবং যে এটার কারণ হয়েছে অর্থাৎ হযরত ওয়াহশী রাযি. যখন তাঁরা দুজন ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করলেন এবং ইসলাম কবূল করলেন, তখন তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুসলমান ভাই ও বোন হয়ে গেলেন। এখন হযরত ওয়াহশীর নামের সাথে رَضِیَ اللہُ عَنْہُ লেখা হয়। হিন্দা যিনি কলিজা চিবিয়েছিলেন তাঁর নামের সাথে رَضِیَ اللہُ عَنْہَا লেখা হয়।

আসল কথা হল তাঁদের ব্যক্তিসত্তার সাথে তো কোন বিদ্বেষ ছিল না বরং তাঁদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। আর যখন ঐ মন্দ বিশ্বাস ও মন্দকর্ম খতম হয়ে গেছে তো এখন তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণের প্রশ্নই আসে না।

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর যুগের একজন বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ.। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. "সূফী" হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর হাকীম ছাহেব রহ. বড় আলেম, "মুফতী" ও "ফকীহ" হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদিকে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. 'সামা' কে জায়িয মনে করতেন। বহু সংখ্যক

সূফীদের নিকট সামার প্রচলন ছিল। 'সামার' মর্ম হল হল: বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত হামদ-নাত ইত্যাদি ভালো বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা সুর সহ অথবা সুর ছাড়া শুধুমাত্র সুললিতকণ্ঠে কারো বলা আর অন্যান্যদের সেটা ভক্তি ও মহব্বতসহ শোনা।

অনেক সূফী হযরত এটাকে জায়িয মনে করতেন এবং এর অনুমতি দিতেন। আবার অনেক ফকীহও মুফতী ছাহেবগণ এ সামা কেও জায়িয মনে করতেন না বরং বিদআত আখ্যায়িত করতেন।

হাকীম মাওলানা যিয়াউদ্দীন ছাহেবও রহ. "সামা" নাজায়িয হওয়ার ফতওয়া দিয়েছিলেন। এদিকে খাজা হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. "সামা" শুনতেন। যখন মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হল, তখন হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আগমন করলেন এবং এ সংবাদ পাঠালেন যে, ভিতরে গিয়ে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. এর নিকট আরয করা হোক যে, নিযামুদ্দীন খেদমতে হাযির হয়েছেন। ভিতর হতে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. উত্তর পাঠালেন যে, তাঁকে বাইরে আটকে দেয়া হোক। আমি মরার সময় কোন বিদআতীর চেহারা দেখতে চাইনা।

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. উত্তর পাঠালেন যে, তাঁর সামনে আরয করা হোক বিদআতী বিদআত থেকে তাওবা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে।

এটা শোনামাত্রই হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ. নিজের পাগড়ী পাঠালেন যে, এটা বিছিয়ে এর উপর জুতা পায়ে দিয়ে যেন খাজা ছাহেব আগমন করেন খালি পায়ে না আসেন। খাজা ছাহেব রহ. পাগড়ী উঠিয়ে মাথায় রাখলেন আর বললেন যে, এটা আমার জন্য দস্তারে ফযীলত। এ অবস্থাতেই তিনি ভিতরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এসে মুসাফাহা করলেন ও বসে গেলেন এবং হাকীম মাওলানা যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. এর প্রতি মনোযোগী হলেন।

পরবর্তীতে খাজা ছাহেবের রহ. উপস্থিতিতে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবের রহ. ইন্তিকালের মুহূর্ত চলে আসে। খাজা ছাহেব রহ. বলেন, আলহামদুলিল্লাহ হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবকে আল্লাহ তাআলা কবূল করে নিয়েছেন। খুব ভালো অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে।

তাহলে দেখুন, সামান্য সময় পূর্বে অবস্থা এমন ছিল যে, চেহারা দেখাও বরদাশত করতে পারছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই বলছেন যে, আমার পাগড়ীর উপর পা রেখে তাশরীফ রাখুন।

গোস্বা যেন আল্লাহর জন্য হয়

যাই হোক, যে গোস্বা বা বিদ্বেষ আল্লাহর জন্য হয় সেটা কখনো ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করেনা। পয়দা করে না কোন ফিতনা। কেননা যার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, যার উপর গোস্বা করা হয় সেও জানে যে, আমার সাথে তার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। বরং বিশেষ কাজ ও বিশেষ চিন্তাধারার সাথে মতপার্থক্য। এজন্য কেউ তার কথাকে খারাপ মনে করে না। কেননা সবাই জানে যে, তিনি যা কিছু বলছেন আল্লাহর জন্য বলছেন।

এটাকেই বলা হয়েছে مَنْ أَحَبَّ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ অর্থাৎ যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করে। তো এটা গোস্বার উত্তম ক্ষেত্র। শর্ত হল এই গোস্বাটা শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ নেয়ামত আমাদেরকে দান করুন। আমাদের ভালোবাসাও যেন আল্লাহর জন্য হয় আবার আমাদের বিদ্বেষও যেন একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য হয়।

কিন্তু এই গোস্বার মুখে যেন লাগাম পরানো থাকে। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর জন্য গোস্বা করা দরকার, সেখানে করবে আর যেখানে গোস্বা করা উচিত নয় সেখানে লাগাম টেনে ধরতে হবে।

হযরত আলী রাযি. এর ঘটনা

হযরত আলী রাযি. কে দেখুন। এক ইয়াহুদী তাঁর সামনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে কোন বেআদবীমূলক কথা বলে ফেলেছে। নাউযুবিল্লাহ। হযরত আলী রাযি. কি আর এটা সহ্য করতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে উপরে উঠিয়েছেন এরপর মাটিতে আছড়ে ফেলে বুকের উপর উঠে বসেছেন। ইয়াহুদী যখন দেখল যে, তার আর বাঁচার কোন পথ নেই, তখন সে শুয়ে শুয়ে হযরত আলী রাযি. এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী রাযি. ঐ ইয়াহুদীকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে গেলেন।

লোকেরা বলল! হযরত! সে তো আরো বড় গোস্তাখীর কাজ করল। কেননা সে আপনার মুখে থুথু দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি তাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলেন কেন? হযরত আলী রাযি. বললেন: আসল কথা হল, প্রথমে যখন আমি তার উপর আক্রমণ করলাম তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে হত্যা করা। যেটা আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতে করেছি। কেননা সে নবীজীর শানে গোস্তাখী করেছে। যদ্দরুন আমার গোস্বা এসেছে এবং আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু যখন সে আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল, তখন আমার আরো বেশি গোস্বা আসল। কিন্তু তখন যদি আমি গোস্বার উপর আমল করে তার থেকে বদলা বা প্রতিশোধ নিতাম, তাহলে সেটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য হত না বরং আমার নিজের জন্য হত। এবং সেটা এ জন্যই হত যেহেতু সে আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে। তাই আমি তাকে আরো বেশি মারব! তো এ অবস্থায় এ রাগ আল্লাহর জন্য হত না বরং নিজের জন্য হত, এজন্য তাকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে গেছি।

মূলত এটা হল ঐ হাদীসে পাকের উপর আমল যেখানে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ

"যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও আল্লাহরই জন্য রাগ করে।"

কেমন যেন সে গোস্বার মুখে লাগাম লাগিয়ে রেখেছে যে, যে পর্যন্ত গোস্বার শরয়ী ও বৈধ সীমারেখা, সে পর্যন্ত গোস্বা করা তো জায়িয। কিন্তু যেখানে গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র শেষ, সেখানে তার থেকে গোস্বা এমনভাবে দূর হয়ে যাবে যে, কেমন যেন তার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। এদের ব্যাপারেই বলা হয়:

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ

অর্থাৎ "এরা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার সামনে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতেন।"[১৬]

হযরত ফারূকে আযম রাযি. এর ঘটনা

একবার হযরত ফারূকে আযম রাযি. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রাযি. এর বাসার নল মসজিদে নববীর দিকে লাগানো। বৃষ্টির পানি মসজিদে নববীতে পড়ছিল।

হযরত উমর ফারূক রাযি. চিন্তা করলেন যে, মসজিদ তো আল্লাহ তাআলার ঘর। আর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বাসার নলের পানি মসজিদে এসে পড়ছে। এটা তো মহান আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধচরণ। ফলে তিনি ঐ নল ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। গোস্বার কারণেই তা ভেঙ্গে দিলেন। আর গোস্বা আসার কারণ হল মসজিদের আহকাম ও আদাবের বিরুদ্ধাচরণ। যখন হযরত আব্বাস রাযি. জানতে পারলেন যে, তার ঘরের নল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, তখন হযরত উমর ফারূক রাযি. এর নিকটে আসলেন এবং বললেন যে, আপনি এ নল কেন ভেঙ্গে দিয়েছেন? হযরত ফারূক আযম রাযি. বললেন যে, এটা তো মসজিদের স্থান। কারো ব্যক্তিগত স্থান নয়। মসজিদের স্থানে কারো ব্যক্তিগত নল শরীয়তের বিধান পরিপন্থী কাজ ছিল। এজন্য আমি ভেঙ্গে দিয়েছি।

---

১৬. সুনানে আবূ দাউদ, অধ্যায় ঈমান বাড়ে ও কমে, হাদীস ৪৬৮১

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন: আপনি জানেন কি এ নল কিভাবে লাগানো হয়েছে? এ নল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে লাগানো হয়েছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ নির্দেশে আমি লাগিয়েছিলাম। আপনি এটা ভাঙ্গার কে?

হযরত ফারূকে আযম রাযি. বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন? হযরত আব্বাস রাযি. বললেন: হ্যাঁ, অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন হযরত ফারূকে আযম রাযি. হযরত আব্বাস রাযি. কে বললেন: আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাথে আসুন। ফলশ্রুতিতে ঐ নলের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে হযরত ফারূকে আযম রাযি. রুকুর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত আব্বাস রাযি. কে বললেন যে, আপনি আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার এ নল স্থাপন করুন। হযরত আব্বাস রাযি. বললেন: আমি অন্য কারো দ্বারা লাগিয়ে নিব। হযরত ফারূকে আযম রাযি. বললেন: উমরের এত বড় দুঃসাহস যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লাগানো নল ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার দ্বারা এত বড় অন্যায় হয়ে গেল। এটার ন্যূনতম শাস্তি এটাই যে, আমি রূকু অবস্থায় থাকব আর আপনি আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে এ নল স্থাপন করবেন। ফলশ্রুতিতে হযরত আব্বাস রাযি. তাঁর কোমরের উপর দাঁড়িয়ে সেই নল পুনঃস্থাপন করলেন। সেই নলটি আজো মসজিদে নববীতে লাগানো আছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। যাঁরা মসজিদে নববী নির্মাণ করেছেন, তাঁরা এখনো সেই নলটি ঐ স্থানেই লাগিয়ে দিয়েছেন। যদিও বর্তমানে এই নলের বাহ্যত কোন ব্যবহার নেই। কিন্তু স্মারক হিসেবে লাগানো আছে।

এটা হল বাস্তবিক পক্ষে ঐ হাদীসের উপর আমল যে مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ অর্থাৎ "যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসল ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখল"।[১৭]

প্রথমে যে গোস্বা ছিল সেটাও আল্লাহর জন্য ছিল আর এখন যে মহব্বত বা ভালোবাসা সেটাও আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি এ কাজটি করল, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল। এটা ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার লক্ষণ।

কৃত্রিম গোস্বা করে বকা দিবেন

যাই হোক, এই بغض فى الله এর কারণে অনেক সময় গোস্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়। বিশেষ করে ঐসব মানুষের উপর গোস্বা প্রকাশ করতে হয় যারা কারো তরবিয়্যতের অধীনে হয়। যেমন শিক্ষককে তাঁর ছাত্রের উপর গোস্বা করতে হয়। পিতাকে সন্তানের উপর, শাইখকে মুরীদের উপর গোস্বা করতে হয়। কিন্তু এই গোস্বা ঐ সীমারেখা পর্যন্ত হওয়া উচিত, যতটুকু ইসলাহের জন্য জরূরী, এর থেকে আগে বাড়বে না। যেমনটি এইমাত্র আরয করা হয়েছে যে, এর পদ্ধতি হল এই যে, যদি কেউ অতিমাত্রায় উত্তেজিত থাকে তাহলে গোস্বা করবে না। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষকের ছাত্রের উপর গোস্বা এসে গেল, তাহলে এই গোস্বার হালতে বকাঝকা এবং মারপিট করবে না বরং সেই রাগ বা গোস্বা খতম হওয়ার পর এবং উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর কৃত্রিম গোস্বা করে বকাঝকা করবে। যাতে করে এই বকাঝকা সীমার বাইরে চলে না যায়। এই কাজ একটু কঠিন। কেননা মানুষ গোস্বার সময় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এর মশক বা চর্চা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গোস্বার ক্ষতি ও অনিষ্টতা হতে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

---

১৭. সুনানে আবূ দাউদ, অধ্যায় ঈমান বাড়ে ও কমে, হাদীস নং ৪৬৮১

ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির ফলাফল

যারা তরবিয়্যতের অধীনে আছেন। যেমন ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী, মুরীদ- প্রমুখ এদের উপর গোস্বার সময় সীমালংঘন হয়ে গেলে অনেক সময় ব্যাপারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কেননা যার উপর গোস্বা করা হচ্ছে, যদি তিনি আপনার থেকে কোন দিক দিয়ে বড় হন বা সমান হন, তাহলে আপনি গোস্বা করার কারণে তার মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে তিনি সেটা প্রকাশও করে দিবেন এবং তিনি বলে দিবেন যে, তোমার একথা বা কাজ আমার ভালো লাগেনি অথবা কমপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে নিবে। কিন্তু যে আপনার ছোট বা অধীনস্ত সে আপনার থেকে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম নয় বরং স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশের উপরও সক্ষম নয়। তাইতো কোন ছেলে তার পিতাকে বা ছাত্র তার শিক্ষককে বা মুরীদ তার শাইখকে বা পীরকে এটা বলবে না যে, আপনি অমুক সময় যে কথা বলেছিলেন তা আমার পছন্দ হয়নি। কেননা আপনার তো জানাই নাই যে, আপনি ঐ ছোট মানুষের অন্তরে কী পরিমাণ আঘাত দিয়েছেন আর যখন খবরই নাই, তো ক্ষমা চাওয়াও সহজ হবে না।

এজন্য এটা অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি ব্যাপার। বিশেষত যারা ছোট্ট শিশুদেরকে পাঠদান করেন, তাঁদের ব্যাপারে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন যে, এদের ব্যাপার তো খুবই নাযুক ও স্পর্শকাতর। কেননা এরা তো অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপার হল এই যে, যদি তারা ক্ষমাও করে দেয় তবুও ক্ষমা হয়না। কেননা তাদের ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা

যাই হোক, আজকের মজলিসের সারকথা হচ্ছে এই যে, নিজের গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে। কেননা এই গোস্বা অসংখ্য খারাবীর মূল। আর এর দ্বারা অগণিত অভ্যন্তরীণ ব্যাধি সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তো এ চেষ্টা করবে যেন গোস্বার বহিঃপ্রকাশই না

হয়। পরবর্তীতে যখন এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তখন দেখবে কোথায় গোস্বা করা যায় আর কোথায় গোস্বা করা যায় না। যেখানে গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র আছে, ব্যস সেখানে জায়িয সীমারেখা পর্যন্ত গোস্বা করবে, এর থেকে বেশি করবে না।

গোস্বার ভুল ব্যবহার

যেমনটি এইমাত্র আমি বললাম যে بغض فى الله অর্থাৎ আল্লাহর জন্য গোস্বা করা উচিত। কিন্তু অনেক মানুষ এটার চরম অপব্যবহার করে। তাইতো মুখে মুখে তো বলে যে, আমার এই গোস্বা আল্লাহর জন্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ গোস্বা অহংকার এবং অন্যকে ছোট মনে করার কারণে হয়। উদাহরণস্বরূপ মহান আল্লাহ দ্বীনের উপর সামান্য চলার তাউফীক দান করলে কেউ কেউ সারা দুনিয়ার মানুষকে হীন ও নীচু মনে করতে থাকে। আমার পিতাও নীচু, আমার মাতাও নীচু, আমার ভাইও নীচু, আমার বোনও নীচু, আমার বাসার সমস্ত সদ্য নীচু। ব্যস সবাইকে নীচু মনে করা আরম্ভ করে দিয়েছে। আর মনে করছে যে, এরা সবাই জাহান্নামী! একমাত্র আমিই জান্নাতী! আমাকে আল্লাহ তাআলা এই জাহান্নামীদের ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন!!

এখন তাদের ইসলাহের জন্য তাদের উপর গোস্বা করা, তাদের জন্য অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করা, তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং তাদের হক নষ্ট করা আরম্ভ করে দিয়েছে। আর এরপর শয়তান তাকে এ সবক পড়ায় যে, আমি যা কিছু করছি এটা "আল্লাহর জন্য দুশমনী" র অধীনে করছি।

অথচ বাস্তবিকপক্ষে এসব কিছু নিজের নফসের চাহিদা অনুযায়ী করছে। তাইতো যারা দ্বীনের উপর নতুন নতুন চলেন শয়তান তাদেরকে এমনভাবে ধোঁকা দেয় যে, তাদেরকে بغض فى الله বা আল্লাহর জন্য বিদ্বেষের সবক পড়িয়ে তার মাধ্যমে অন্যান্য মুসলমানদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করায় যদ্দরূন পরস্পরের লড়াই, ঝগড়া ও ফাসাদ হয়।

কথায় কথায় মানুষের উপর গোস্বা করে। সামান্য সামান্য কারণে মানুষকে গালমন্দ করে। যদ্দরূন ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর একটি কথা

হযরাতুল আল্লাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর একটি কথা সব সময় মনে রাখার মত। তিনি বলতেন: হক কথা, হক নিয়্যতে, হক পদ্ধতিতে বলা হলে সেটা কখনো প্রতিক্রিয়াবিহীন থাকে না। এবং এর দ্বারা কখনো ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হয় না। কেমন যেন হযরত তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। ১. কথা হক হবে, ২. নিয়্যত হক হবে, ৩. পদ্ধতি হক হবে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজে লিপ্ত। এখন যদি কেউ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে, নরমভাবে, স্নেহের সাথে তাকে বুঝায়, যাতে করে সে ঐ খারাপ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে। এই নিয়্যত থাকে। নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য না হয় কিংবা অন্যকে ছোট করাও উদ্দেশ্য না থাকে। আর পদ্ধতিও হক থাকে অর্থাৎ নম্রতার সাথে স্নেহ-ভালোবাসামিশ্রিত কণ্ঠে কথা বলে, যদি এ তিনটি শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে সাধারণত ফিতনা হয় না।

আর যদি কোথাও এমন দেখা যায় যে, হক কথা বলার কারণে ফিতনা দাঁড়িয়ে গেছে, তাহলে প্রবল ধারণা এটাই যে, এর কারণ হল ঐ তিনটি শর্তের মধ্যে কোন শর্ত ছুটে গেছে। হয়ত কথা হক ছিল না অথবা নিয়্যত হক ছিল না, অথবা পদ্ধতি হক ছিল না।

তোমরা খোদায়ী ফৌজদার নও

এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, আমরা খোদায়ী ফৌজদার বা সেনাপতি হয়ে দুনিয়াতে আসিনি। আমাদের কাজ শুধু এতটুকুই যে, হক কথা, হক নিয়্যত ও হক পদ্ধতিতে অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। মুনাসিব বা উপযুক্ত পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে পৌঁছাতে থাকা। এ কাজে কখনো বিরক্ত হওয়া যাবে না। অবশ্য এমন কোন কাজও করা যাবে না, যার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি হয়।

মহান আল্লাহ নিজ রহমতে এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাউফীক দান করেন। আমীন।

وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ